ভালো রেজাল্ট করতে হলে
ডা. জাকির হোসেন লস্কর পি.এইচ.ডি.
ডা. জাকির হোসেন লস্কর ঃ এম.এস.সি (মুম্বাই), ডি.এইচ.এম.এস (ক্যাল),
এম.এস. (কাউন্সেলিং এ্যাণ্ড সাইকোথেরাপি), পি.এইচ.ডি.
নিউরো-সাইকিয়াট্রিতে বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক
এডুকেশনাল কাউন্সেলিং সাইকোথেরাপিস্ট
এ বুক অন
মেমোরি ইমপ্রুভমেণ্ট টেকনিক্স,
স্টুডেণ্টস্ অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার মডিফিকেশন,
লার্নিং ডিসএবিলিটি ম্যানেজমেণ্ট
এণ্ড
গুড্ পেরেন্টিং স্কিলস্
Dr. Jakir Hossain Laskar, PhD
BrainMindia™
Homoeopathy Neuro-Psychiatry Clinic
An ISO 9001: 2015 Certified Clinic
বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য পুস্তক
১৫০/-
ই-বুক
প্রথম সংস্করণ
ভালো রেজাল্ট করতে হলে
ডা. জাকির হোসেন লস্কর
ব্রেনমাইন্ডিয়া
ভালো রেজাল্ট করতে হলে
বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়
পড়াশুনার টাইম-ম্যানেজমেণ্ট ও পরীক্ষার আগে পড়াশোনার আদব-কায়দা
কোন্ কোন্ খাবার খেয়ে মেমরি ও ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানো যায়
ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সমস্যা ও প্রতিকার
শৈশব-কৈশোরের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিকার
লার্নিং ডিসএবিলিটি ম্যানেজমেণ্ট শিখে শিক্ষায় মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ানো
সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্যে পিতা-মাতার কর্তব্য
ডা. জাকির হোসেন লস্কর

ভালো রেজাল্ট করতে হলে

ডা. জাকির হোসেন লস্কর

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায়
কিভাবে বুদ্ধি-মেধা বাড়াবে
ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি উন্নয়নের পদ্ধতি
আমরা শেখা জিনিস ভুলে যাই কেন
ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানোর উপায়
মনঃসংযোগ বাড়ানোর পদ্ধতি
কোন্ কোন্ খাবার খেয়ে মেমরি ও ব্রেন পাওয়ার বাড়ানো যায়
ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানোর মানসিক ব্যায়াম
কিভাবে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া যায়
পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে
সন্তানের মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা
ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সমস্যা ও প্রতিকার
শৈশবের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিকার
কৈশোরের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিকার
ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণে পিতা-মাতার করণীয়
গুড পেরেন্টিং স্কীলস্ ঃ বাবা-মায়েরা কি করবেন ও কি করবেন না
ছাত্রজীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি

ভালো রেজাল্ট করতে হলে

ডা. জাকির হোসেন লস্কর

ব্রেণমাইণ্ডিয়া ঃ

হোমিওপ্যাথি নিউরো-সাইকিয়াট্রি ক্লিনিক

Book:

Valo Result Korte Hole

Author:

Dr. Jakir Hossain Laskar, PhD

First Edition: July, 2013 (Bliss Foundation)
Second Edition: January, 2018 (Suswastha Publishers)
Third e-Book Edition: May, 2021 (BrainMindia Version)

Copyright: @ Reserved with the Author

Published By:

BrainMindia Homeopathy Neuro-Psychiatry Clinic
85 Bentinck Street, Kolkata - 700001 (Beside Lalbazar 4-Point Crossing)
West Bengal, India.

Composed By:
Nation Institute of Creative Performance
24/4, Raja S.C.Mallick Road, Jadavpur, Kolkata - 700032
(Near Jadavpur University)

Designed By:
Santanu Sengupta, Sonarpur, Kolkata - 700150
Rabi Nandi, Rajpur, Kolkata - 700149

Publication Research Associate:
Prasenjit Sarkar, Kallol Basal, Payel Bose, Dhruba Jyoti Das

Dial at BrainMindia Clinic:
+91-9831148112 | +91-9836913018

Website:
www.brainmindaiclinic.com

*[All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author and publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication will be liable to legal prosecution and civil claims for damages. Disputes if any are subject to Kolkata jurisdiction only. - **PUBLISHER**.]*

Price: 275/-

লেখকের কথা

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা নিয়ে নানান সমস্যা। কারুর শুনি মনোযোগের সমস্যা, কারুর বা বুদ্ধি-মেধা ও স্মৃতিশক্তির সমস্যা, আবার কারুর দেখি নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের বিকার-জনিত সমস্যা। এক দশকেরও বেশী সময় ধরে স্নায়ুরোগ ও মানসিক রোগের চিকিৎসা করার সুবাদে শিক্ষার্থীদের বিবিধ লার্নিং ডিসএবিলিটি ও অ্যাবনর্যাল বিহেভিওর-এর কাউন্সেলিং ও ট্রিটমেণ্ট করে চলেছি। কেউ বলেন, আমার সন্তান অল্পবুদ্ধি, শিক্ষামুলক পরিবেশের সঙ্গে সে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে অপারগ বা মানসিক আঘাত-জনিত কারণে অস্বাভাবিক আচরণমূলক রোগের শিকার। কেউ বা বলেন মেয়ে আমার লেখাপড়ায় ক্লাশে পিছিয়ে পড়ছে, তার বুদ্ধি বিকারগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে তার স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দিচ্ছে ও তার মনে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অনেকে আবার বলেছেন, তাঁর ছেলের মধ্যে তাঁরা স্কুলভীতি, পরীক্ষাভীতি ও একাগ্রতার অভাব লক্ষ্য করছেন, বা সে কাল্পনিক ভয়ের কথা বলছে অথবা তার মধ্যে অপরাধী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ইত্যাদি। প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ও অস্বাভাবিক আচরণ-সংক্রান্ত এইসব নানাবিধ সমস্যার প্রতিকার কোন্ পথে, এই প্রশ্নই আমাকে এই বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

ছাত্রজীবনে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে কী কী করণীয় তা বিস্তারিত বিশ্লেষণের পাশাপাশি এই পুস্তকের প্রথমার্ধে পড়াশুনার স্মৃতি সহায়ক পদ্ধতি ও টাইম ম্যানেজমেণ্ট-শিক্ষার্থীদের মনে রাখার নানা উপায় নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। শিক্ষায় মনোযোগ ও আগ্রহ বাড়ানোর উপায় এবং স্মরণ-ক্রিয়াকে কী কী ধরণের অনুশীলনের সাহায্যে উন্নতি করা যায়, তা নিয়েও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তি ও আই-কিউ (সাইকোমেট্রি) মাপার সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্বসাধারণের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বই পড়ে আপনি জেনে নিতে পারেন, কোন্ কোন্ খাবার খেয়ে মেমরি ও ব্রেন পাওয়ার বাড়ানো যায়। পুস্তকের দ্বিতীয়ার্ধে জড়বুদ্ধির কারণ ও তার প্রতিকারে পিতা-মাতার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণের বিকাশ-জনিত সমস্যার প্রতিকারে পিতা-মাতার প্রতি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার প্রয়াস করেছি। প্রসঙ্গক্রমে, আবেগতাড়িত অতিচঞ্চলতা ও অমনোযোগীতার সমস্যা প্রতিকারে অভিভাবকদের কী কী করণীয - তা প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছি। এছাড়াও, ছাত্র-ছাত্রীদের মদ ও ড্রাগের নেশা সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সবশেষে, ছাত্রজীবনে সাফল্যের জন্যে কিভাবে গঠনমূলক চিন্তা করতে হয় ও কোন্ পথে প্রকৃত সাফল্য আসে, তা সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি।

"**ভালো রেজাল্ট করতে হলে**" ছাত্র-ছাত্রীদের এই বইয়ের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা মন দিয়ে পড়তে হবে। অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের প্রতি সবশেষে আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা এই পুস্তকের প্রয়োগ-পদ্ধতি সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করে আপনাদের সন্তানদের শেখানোর জন্যে সযত্ন প্রয়াস করবেন। সমাজে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ এই বই পড়ে উপকৃত হলে, আমার এই পরিশ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে।

ডা. জাকির হোসেন লস্কর

বুদ্ধি
মেধা
স্মৃতিশক্তি

Chapter -- 1

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায়

১) চাঙ্কিং (Chunking) — মানে গ্রুপিং বা ছোট ভাগে বিভক্ত করা। ল্যাণ্ড-ফোন বা মোবাইল নাম্বার মনে রাখার জন্যে অথবা কঠিন বানান মনে রাখার জন্যে পুরানো এই পদ্ধতি দারুণ কার্যকরী। উদাহরণস্বরূপ —

(ক) ৯৮৩১১৪৮১১২ — এই মোবাইল নাম্বারটা সহজে মনে রাখার জন্যে ডিজিটগুলোকে এইভাবে গ্রুপিং করে নিতে পারো — ৯৮৩, ১১, ৪৮, ১১২

(খ) "Lieutenant" (লেফটেন্যান্ট) — এই শব্দটি এইভাবে সহজে মনে রাখা যেতে পারে — "Lieu+ten+ant". আবার যেমন, "Together" — এই শব্দটি মুখস্থ রাখার জন্যে আমরা ভেঙে ভেঙে এইরকমভাবে বলতে পারি — "To+get+her"

(গ) ধর তোমাকে বাজারে পাঠিয়ে বলা হল, আলু, নাশপাতি, ফুলকপি, কমলালেবু, হলুদগুড়ো, উচ্ছে, আপেল, পটল আর গোটা জিরে ও তেজপাতা এগুলো পরিমাণমত এনো। এবার এই জিনিসগুলোর নাম যদি ফর্দ করে না দেওয়া হয়, তুমি কি মনে করে সব ঠিকঠাক আনতে পারবে? তুমি পারবে, যদি তুমি চারটে সবজি তিনটে ফল আর তিনটে মসলাকে গ্রুপিং করে মনে রাখতে পারো।

২) বেড টাইম রিসাইটাল (Bed-time recital) — যে পাঠ্যবিষয় তোমার মনে রাখতে হবে, দিনের কোনো এক সময় পড়ার পরে তার সংক্ষিপ্তসার একটুকরো কাগজে লিখে রাখো। রাত্রে শুতে যাবার আগে দু'-তিনবার সেটা জোরে জোরে আবৃত্তি করে তারপর রিল্যাকস্‌ড মুড-এ বিছানায় যাও। এবার যখন তুমি ঘুমাবে, তখন তোমার মেমরি সেন্টার সদ্য শেখা তথ্যাবলী (informations) একের পর এক শ্রেণীবদ্ধ করে মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখবে।

৩) মেণ্টাল একসারসাইজ (Mental exercise) — যেসব তথ্যগুলো তুমি অডিটোরি লার্নার বা ভিস্যুয়াল লার্নার হিসাবে শিখছো, সেগুলো মনে রাখার জন্য তোমার লার্নিং স্টাইল-এ অনুবাদ করে নাও। দেখে পড়া বা কানে শুনে শেখা তথ্যাবলী এই পদ্ধতিতে শিখে নেওয়া সহজ। অন্যান্য কায়দা-কানুনগুলো দেখে নাও।

(ক) বেশ কয়েকবার বুক-ভরা শ্বাস নাও যখন তুমি নুতন কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে বসছো।

(খ) তথ্যের সাথে নতুন একটি তথ্যের অনুষঙ্গ গড়ে তুলতে না পারলে, তা কখনোই জ্ঞানে রূপান্তরিত হবে না এবং বেশিদিন তা স্মৃতিপথে থাকবেও না।

(গ) তোমরা সবাই জানো, ছোট বাচ্চাদের যদি সুরে-তালে আর নাচের সঙ্গে কোনো ছড়া বা রাইমস্ শেখানো হয়, তারা তা সহজে ও তাড়াতাড়ি শিখে ফ্যালে। তোমরা যারা বড়োরা, তারা টেকনিক্যাল ইনফরমেশন-কে নিজ নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাথে রিলেট করে পাঠ্যবিষয় পড়লে উপকৃত হবে।

(ঘ) নিজের ফাঁকা পড়ার ঘরে শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করো। মনে করো, তোমার সামনে ঘর-ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী বসে তোমার পড়ানো শুনছে। হাতের ভঙ্গীসহ অন্যান্য যে সব স্টাইল ব্যবহার করে ক্লাস টিচার তোমাদের 'ড্রামাটিক ওয়ে অব টিচিং' উপহার দেন, সেগুলোর সাহায্যে পড়ানোর পদ্ধতি অনুকরণ করে তুমি পাঠ্যবস্তু বলতে থাকো। দেখবে, মনে রাখার তথ্যগুলো কত স্পষ্টভাবে তোমার মনে থাকবে।

৪) ব্রিজিং (Bridging) — একটি ঘটনা অন্য ঘটনার তথ্যের অনুষঙ্গে মধ্যস্থতা করে স্মরণক্রিয়াকে সহজতর করে। ইতিহাস পাঠের সময় ঘটনার সাথে ঘটনার সেতুবন্ধন না করে পড়লে মনে রাখা খুবই কঠিন।

৫) নেমোনিকস (Mnemonics) —

(ক) তথ্যের সংকলনে যে ঘটনার সৃষ্টি হয় তাকে বর্ণিল প্রাণবন্ত চিত্রকল্পের সাহায্যে মনে রাখতে চেষ্টা করলে শিখন-প্রক্রিয়া সহজ হয়।

(খ) খটোমটো লাগে, অদ্ভুত রকম শুনতে লাগে এমন জিনিসের সাথে তোমরা পাঠ্যবস্তুকে রিলেট করে পড়ো, খুব সহজে মনে থাকবে।

(গ) ত্রি-মাত্রিক ছবি আমাদের সহজে নজর কাড়ে। আর তথ্যের অনুষঙ্গের মধ্যে যদি ধারাবাহিকতা থাকে, তবেই তোমরা ব্যবহৃত নেমোনিকস্ থেকে উপকৃত হবে।

(ঘ) যে বিষয় শিখতে হবে তার সাথে যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমন্বয় করতে পারো, তাহলে শিখতে তোমার সুবিধা হবে। স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, গতিশীলতা, অনুভূতি ও ছবির অনুষঙ্গে যদি তুমি শিখতে পারো, তা খুবই স্মৃতি-সহায়ক হবে।

৬) ব্রেণ-বুস্টিং একসারসাইজ (Brain-boosting exercise) — শরীর নীরোগ ও সুস্থ রাখার জন্যে যেমন আমরা ব্যায়াম ও জিম্ করি, তেমনি ব্রেন-পাওয়ার বাড়ানোর জন্যে কিছু ভালো ব্যায়াম আছে।

(ক) অ্যারোবিক (Aerobic) — এতে ব্রেনের রক্ত সংবহন ত্বরান্বিত হয় ও স্মৃতিকোষগুলোর সজীবতা ফিরে আসে।

(খ) অ্যানারোবিক (Anaerobic) — এই পদ্ধতিতে সেরিব্রো-ভাস্কুলার ফিটনেস বাড়ানো যায়, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মেমরি পাওয়ার বৃদ্ধি পায়।

(গ) স্ট্রেনথ ট্রেনিং ও কোর একসারসাইজ (Strength training and core exercise) — যে সকল ব্যায়ামের সাহায্যে স্পাইনাল নার্ভের শক্তিবৃদ্ধি হয়, তোমার মাসল্-এর শক্তিবৃদ্ধি হয়, তোমার ফিজিক্যাল ট্রেনার-এর সাহায্যে সেগুলো চর্চা করলে তোমার ব্রেন পাওয়ার বাড়বে।

৭) রিডিং ডিনামিকস্ ঃ মেটা গাইডিং ও স্কিমিং (Reading dynamics : Meta guiding and Skimming) —

(ক) মেটা গাইডিং (Meta guiding) — পাঠ্যবিষয়ের যে লাইনটা তুমি পড়ছো তার নিচে আঙুল বা পেনসিল দিয়ে পাঠক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে গেলে, তা শিখন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

(খ) স্কিমিং (Skimming) — এই পদ্ধতিতে স্পিড রিডিং করার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাসা-ভাসা চোখ বুলিয়ে পাঠ্যবিষয়ের দরকারী অংশে মনঃসংযোগ করা হয়। বিশেষত, ইতিহাসের অনেক দীর্ঘ পাঠ সংক্ষিপ্তসার আকারে মনে রাখার জন্যে এই পদ্ধতি কার্যকরী।

Chapter -- 2

কিভাবে বুদ্ধি-মেধা বাড়াবে

১) ইমেজ স্ট্রীমিং ও সেল্ফ-ফুলফিলিং প্রফেসি (Image streaming and Self-fulfilling prophecy) — ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই বুদ্ধি বাড়ানোর কৌশল দুটি রপ্ত করতে পারে, তাহলে তাদের লেখাপড়ার পদ্ধতির উৎকর্ষসাধন হবে।

(ক) ফিডব্যাক্ (Feedback) — তোমার পড়ার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে বা মেঝেতে মাদুর পেতে বসো। ঘরের বা তৎসংলগ্ন পরিবেশ শান্ত হলে ভালো হয়। এবার তুমি চোখ বন্ধ করো। দেখবে, তোমার সামনে নানা ছবি ভেসে উঠছে। তুমি এবার তা উচ্চারণ করে বর্ণনা করো। এভাবে আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন বিকশিত হবে এবং তোমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ঘটবে।

(খ) ফিড্-ফরওয়ার্ড (Feed-forward) — তোমার স্টাডি টেবিল-এর সামনের চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করো। এবার ভাবার চেষ্টা করো, ভবিষ্যতে তুমি যা হতে চাও তার পরিমণ্ডল রচনা করতে। সফল সেই ভবিষ্যত নির্মাণের পর প্রাপ্ত আনন্দকে তুমি তোমার বর্তমান জীবন ও জীবনচর্যাকে আস্বাদন করার সুযোগ দাও। মোটকথা, ভবিষ্যতের সাফল্যকে যদি তুমি বর্তমানে দারুণভাবে উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে সুন্দরভাবে তোমার কল্পনাশক্তির বিকাশ হবে যা বুদ্ধি বাড়াতে অব্যার্থ।

২) রিটেনশান (Retention) — বুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে শেখা ঘটনার যদি একটা ইমাজিন্যারি ইমেজ আনুষঙ্গিক তথ্যের সাথে মাথায় রাখতে পারো, তাহলে শিখনপ্রক্রিয়া উৎকর্ষমণ্ডিত হবে।

৩) ব্রেস্ট ফিডিং ইমপ্রুভস্ ইণটেলিজেন্স (Breast feeding improves intelligence) — যে সকল বাচ্চা মাতৃদগ্ধ পান করার সুযোগ পায়, তাদের মেধা ও বুদ্ধি সাধারণত বেশি হয়। মাতৃদুগ্ধ শরীর ও নার্ভের ইমিউন সিস্টেম-কে শক্তিশালী করে রাখে। মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা এক মেমরি সেল থেকে তথ্য নিয়ে অন্য মেমরি সেল-এর মাধ্যমে স্মৃতির মণিকোঠায় স্টোর করতে সাহায্য করে।

৪) এসেনসিয়াল ইনগ্রেডিয়েণ্টস (Essential Ingradients) — এমন কিছু উপাদান আছে যারা ব্রেন-এর পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে। কিছু কিছু ট্রেস-এলিমেণ্ট আছে যারা আবার মেমরি সেল যাতে ড্যামেজ না হয়ে যায় তার খেয়াল রাখে। কেউ কেউ আবার হায়ার কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট-এর জন্যে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

(ক) ম্যাঙ্গানিজ — যে সকল প্রাণীদের আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি, তাদের লিভার, হাড় বা অগ্নাশয় ইত্যাদিতে প্রচুর সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ থাকে।

(খ) প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড — আখের গুড়, মিষ্টি আলু ও মটরশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(গ) নিয়াসিনামাইড — ভিটামিন বি৫ থেকে প্রাপ্ত নিয়াসিনামাইড পাওয়া যায় চীনাবাদামে, সোয়াবিন ও ভোজ্য প্রাণীদের লিভারে।

(ঘ) এল-টাইরোসিন — মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় মেমরি সেল-এর প্রোটিনগুলোকে গঠনদান করে।

(ঙ) ২-ডাইমিথাইল অ্যামাইনো ইথানল (DAME) — এটি এমন এক ধরনের অ্যাসিটাইল-কোলিন প্রিকাসর, যা পরবর্তী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ উন্নতমানের নিউরোট্রান্সমিটার তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, মেধাশক্তির উন্নয়ন এবং দীর্ঘক্ষণ মনঃসংযোগ ধরে রাখতে DAME-এর জুড়ি নেই।

Chapter -- 3

ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি উন্নয়নের পদ্ধতি

১) প্রোফাউণ্ড আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং অব দ্য সাবজেকট্ — একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে স্মৃতির তথ্যভাণ্ডারে জমা করে রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লে বিষয়কে বুঝে নিতে সুবিধা হয়— যার জন্যে নানাবিধ অনুভূতির সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানকে ব্রেন-এর মেমরি সেল-এ রাখতে সুবিধা হয়। যে বিষয়ে পড়া করতে হবে, তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সচেতনভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

(ক) আনইন্টারাপটেড কনসেনট্রেশন — পড়ার সময় বাইরের জগতের বিবিধ আওয়াজ যেন তোমার মনকে প্রভাবিত না করে। পাশের ঘরের কথাবার্তা বা দূর থেকে মাইকে ভেসে আসা গানের আওয়াজ যেন তোমার মনকে পড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। পাঠ্যবিষয় অখণ্ড একাগ্রতায় পড়তে পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিষয় সহজেই মনে রাখতে পারবে।

(খ) মেণ্টাল ইনভলভমেণ্ট — বিষয়বস্তুর সাথে মনোযোগকে সম্পৃক্ত করতে পারলে পড়া বুঝে নেওয়া সহজ হয়।

(গ) ডিপ্ অ্যাটেনশন — পড়ায় মন বসাতে হলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া অভ্যাস করতে হবে। পাঠ্যবিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতা প্রসারিত করতে হলে ছাত্রাবস্থা থেকেই ধ্যান (meditation) অভ্যাস করা দরকার। প্রথিতযশা শিক্ষবিদরা মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে যোগব্যায়াম চর্চার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশন অব ইনফরমেশন — একই বিষয়ের পূর্ব অর্জিত জ্ঞান বা তথ্যের সাথে নতুন পড়া তথ্যকে সংযুক্ত করতে পারলেই স্মৃতিভাণ্ডারে তা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সংরক্ষিত থাকে। একই বিষয়ের নানাবিধ তথ্য পরস্পরকে মনে রাখতে সাহায্য করে।

(ঙ) রিকলিং অ্যানাদার টপিক — বাইরের অন্য সবকিছুর প্রভাব থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ্যবিষয়ে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করার অভ্যাস করো। এক বিষয় পড়ার সময় কখনোই অন্য বিষয়ের চিন্তা মাথায় এনো না।

(চ) প্রোফাউণ্ড আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং —

১. ব্রাইট কালারস ও লাউড রিডিং — অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে যার তীব্রতা বেশি, সেটি সহজে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। উজ্জ্বল আলোর সামনে বই রেখে পড়লে মনোযোগের তীব্রতা (intensity) বাড়ে। বইয়ে লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত উজ্জ্বল রঙের ছবি থাকলে পাতায়, তা বেশ মনঃসংযোগ আকর্ষণ করে। আস্তে না পড়ে উচ্চৈঃস্বরে পড়লে পাঠ্যবস্তুর প্রতি মেন্টাল ইনভলবমেন্ট বাড়ে, যা শিখনের স্মৃতি-সহায়ক।

২. রিঅ্যাপিয়ারেন্স অব সেম টপিক — কোনো শেখা জিনিস অনেকদিন পর যদি পুনরায় পড়া হয়, তবে তা বিশেষ মনোযোগ উদ্রেককারী হয়ে থাকে। সেজন্যে বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে বুঝে নেবার জন্যে রিপিটেটিভ রিডিং কার্যকরী।

৩. প্রেফারেন্স অব রিডিং — যে বিষয়ে তুমি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সেটাতে বেশি করে সময় দেওয়া দরকার। বেশিক্ষণ ধরে অনেকবার একটা পাঠ্যাংশ বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করলে তা উপলব্ধির সীমানার মধ্যে চলে আসে।

৪. নিউ টপিকস্ — মনঃসংযোগের বিচ্যুতি হলে পাঠের বোধগম্যতা ব্যহত হয়। সেজন্যে একই বিষয় প্রত্যেকদিন একঘেঁয়েমিভাবে না পড়ে, নতুন কোনো বিষয়ে মন দিলে তা সহজেই গভীরভাবে উপলব্ধি হবে।

৫. মেণ্টাল ডিসপজিশন — কোনো কিছু শিখে তা কাজে লাগানোর আবেগ ও আগ্রহ তোমাকে পাঠে অতিরিক্ত মনোযোগী করে তুলবে। ভালো রেজাল্ট করাকে তুমি যদি অভ্যাসে পরিণত করতে পারো এবং তাতে তোমার সেণ্টিমেণ্ট ও টেম্পারামেণ্ট যদি সাথী হয় তবে পাঠে তোমার উপলব্ধি গভীরতর হবে। জানবার কৌতুহল মেটানোর জন্যে যদি তোমার সহজাত প্রবৃত্তি আর জন্মগত মানসিক প্রবণতা ক্ষুধার্ত থাকে, তবে বিষয়বস্তু গভীরভাবে উপলব্ধি করতে তোমার বেগ পেতে হবে না।

(ছ) শিক্ষকরা কিভাবে ছাত্রদের স্কুলে মনোযোগী করে রাখেন —

১. নন-ভলিশন্যাল অ্যাটেনশন (Non-volitional attention) — প্রথম দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে এবং শুধুমাত্র কৌতুহল, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিশেষ বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নানান সেন্টিমেন্ট তৈরি হতে থাকে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যদি সেইসব সেন্টিমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত মনোযোগকে শিক্ষার ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে সহজ ও সাবলীলভাবে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষাগ্রহণ করবে। এইসব নানাবিধ স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে, তার জন্যে শিক্ষকমহাশয়দের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেন্ট, শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সেন্টিমেন্ট, আর লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্যে যথাযোগ্য সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে হবে।

২. ভলিশন্যাল অ্যাটেনশন (Volitional attention) — শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা ইচ্ছাযুক্ত মনোযোগের দ্বারা বিকশিত হয়। শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিমূর্ত ধারণা বা অ্যাবস্ট্রাকট আইডিয়ার প্রতি আগ্রহান্বিত করা। যাতে তাদের সক্রিয় ইচ্ছার মধ্যে জাগ্রত হয় আদর্শবাদের ভাবনা। তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগের সৃষ্টি হবে যা তাদের পরবর্তী জীবনে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে। ধীরে ধীরে সেই জীবনদর্শন-সমৃদ্ধ মনোযোগ ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের মতই সারা জীবনব্যাপী জ্ঞান অন্বেষণে ও অর্জনে সহায়তা করবে।

৩. স্প্যান অব অ্যাটেনশন (Span of attention) — প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একসঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, কারণ প্রত্যেকের মনোযোগের পরিসর বিভিন্ন। একজন ছাত্রের মনোযোগের ক্ষেত্র তার ব্যক্তিগত সীমার বাইরে যেতে পারে না, এটা মাথায় রেখে পাঠের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে এমন বিষয়ের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্রভাবে তার প্রতি নজর দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করে নিয়ে চর্চা করলে সুবিধা হবে।

৪. সাইকেল অব অ্যাটেনশন (Cycle of attention) — মনোযোগের চঞ্চলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি সজাগ থেকে শিক্ষক মহাশয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বয়সের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্যে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা উচিৎ নয়, যার প্রতি অনেকক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে হয়। এছাড়াও মনে রাখতে হবে, বেশ কিছুক্ষণ অন্তর অন্য বিষয়ে মনোযোগকে পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ দিলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সদাচঞ্চল, তাদের পক্ষে বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাদের জন্যে দরকার হলে শিক্ষকের উচিৎ বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে তাদের নির্ভুল জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা।

৫. মেথডস অব টিচিং (Methods of teaching) — ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো বিষয় বোঝানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ডে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে লেখা পরিষ্কার স্পষ্ট ও অবশ্যই বড় হরফে লিখতে হবে। ড্রামাটিক ওয়ে অব টিচিং বা একই বিষয় বিভিন্নভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষককে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের টিচিং এইডস্-এর সাহায্যে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপন করলে, পাঠ্যক্রিয়ার মধ্যে অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয় যা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে মনঃসংযোগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

২) গুড্ মেমোরাইজেশন পদ্ধতি — নানা ধরণের তথ্যপঞ্জী পারম্পর্য রক্ষা করে মনে রাখা ও প্রয়োজনে তা যথাযথভাবে স্মরণ করার কৌশল রপ্ত করা যায় তথ্যের অনুষঙ্গ ও ইমাজিনেটিভ ব্রেণ-এর সঠিক চর্চার মাধ্যমে। সনাতন ভারতীয় শিক্ষাবিদরা স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্যে 'সুর-আবৃত্তি-অধ্যয়ন'-এর বিজ্ঞান-সম্মত চর্চার উপর গুরুত্ব দিতেন। এখন দেখ পাঠ্যবস্তু ট্রু মেমরি-তে ধরে রাখার জন্যে স্মৃতি সহায়ক কিছু পদ্ধতি।

(ক) রিপিটেড রিডিং — একই বিষয়বস্তু বারংবার পড়লে সহজেই স্মৃতিকোষে তা সংরক্ষিত হবে। স্মৃতি যদি তথ্যের সংকেত উদ্ধার করতে পারে, তাহলে সে তা স্মৃতিকোষে জমা করে রাখে।

(খ) গুড পারসেপশন — গভীর মনঃসংযোগের সাথে পড়াশোনা করলে তথ্যের সূত্র সহজেই অনুধাবন করা যায়। অনুভূতির তীব্রতা পাঠ্যবিষয়কে স্মৃতিভাণ্ডারে জমিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

(গ) সাইন্যাপটিক রেজিসট্যান্স — বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর মেমরি বিভিন্ন রকম। মানুষে মানুষে বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তির এই যে পার্থক্য, এর পিছনে বংশগতির (genetic transmission) কোনো ভূমিকা নেই। পাঠ্যবিষয়ে অপার আগ্রহ, পড়ার ঘরের পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের উজ্জীবিত মানসিক অবস্থার সাথে পড়াশোনার সঠিকপদ্ধতির একনিষ্ঠ প্রয়োগেই স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়। কোনো বিষয়ের ইনফরমেশন সিগন্যাল যত বেশীবার মেমোরি লেন-এ থাকা সাইন্যাপসের পথ দিয়ে যাবে, তত কমে যাবে সাইন্যাপটিক রেজিসট্যান্স পাওয়ার এবং অবশেষে সেই তথ্যপঞ্জী আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারে গিয়ে জমা হবে। সুতরাং তুমি যত পড়বে, ততই কমে আসবে সাইন্যাপসের প্রতিরোধ। সাইন্যাপসের প্রতিরোধের ধাক্কায় পাঠ্যবিষয় যাতে স্মৃতি থেকে হারিয়ে না যায় তা জন্যে বারবার পড়া জরুরী।

(ঘ) সঠিক উচ্চারণে জোরে জোরে পড়া — কম বয়সের ছাত্র- ছাত্রীদের জোরে জোরে পড়া অভ্যাস করা উচিৎ। উচ্চারণ নির্ভুল ও সঠিক রেখে জোরে জোরে সশব্দে পড়লে শ্রুতি ও অনুভূতি একযোগে তথ্যের সংকেতকে স্মৃতিভাণ্ডারে পাঠাতে পারে।

(ঙ) অন্যদের শেখানো — আমাদের ভারতীয় সনাতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রাবস্থায় নিজের পড়াশোনার সাথে সাথে অন্যদের পড়ানোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হোত। নিজের শেখা জিনিস অন্যকে শেখালে সেই বিষয়বস্তু স্মৃতিসহায়ক হয়ে ওঠে।

(চ) সমবেত পাঠ — অনেক ছাত্র-ছাত্রী মিলে একত্রে সমবেত সুরে পাঠ্যবিষয় চর্চা করলে তা মনঃসংযোগে দারুণ সাহায্য করে এবং তাতে পড়ার আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়। নিম্ন-বুনিয়াদি পাঠশালায় এ ধরণের স্মৃতিসহায়ক অভ্যাস তাদের বিষয়গত জ্ঞানকে গভীর করে তুলতো।

৩) স্টেপস অব স্ট্রং মেমোরি (Steps of strong memory) — ব্রেন-মেমরিতে কোনো তথ্য পাকাপাকিভাবে প্রথিত করে নিতে হলে স্মৃতিশক্তির বেশ কয়েকটি ধাপকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করতে হয়। প্রথম ধাপে তথ্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হয়। তারপরে সেই তথ্যকে মেমোরি সেন্টার-এ সুদীর্ঘকাল ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে স্মৃতির মণিকোঠায় জমিয়ে রাখা তথ্যদের যখন যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী স্মরণ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। ধাপগুলি নিম্নরূপ:

(ক) ডিপ পারসেপশন (Deep perception) — অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তরের প্রক্রিয়াই হল অনুধাবন।

(খ) গুড রিটেনশন (Good retention) — স্মৃতির ভাণ্ডারে তথ্যকে দীর্ঘকাল ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে নিম্নে দেওয়া প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

১. আগ্রহ — বিশেষ কোনো বিষয়ের প্রতি যদি কোনো ছাত্রের আগ্রহ বেশী থাকে, তাহলে সেই বিষয়ের প্রতি শেখার ইচ্ছা তার তত প্রকট হবে এবং ফলতঃ তা তার স্মৃতিভাণ্ডারে দীর্ঘকাল মনে থাকার সম্ভাবনা তৈরি করবে। গণিতের প্রতি আগ্রহ আছে এমন ছাত্র, অঙ্কের ফর্মুলা, সম্পাদ্য-উপপাদ্য ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখতে পারবে বেশি।

২. সচেতন প্রয়াস — সযত্ন প্রয়াস ও আন্তরিক চেষ্টা ছাড়া শুধুমাত্র গভীর আগ্রহ দিয়ে কোনো বিষয়কে দীর্ঘকাল মেমরিতে সংরক্ষিত করা যায় না। মনে রাখার প্রচেষ্টা যে যত বেশি করবে, তার মনেও থাকবে তত বেশি।

৩. প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী — পরীক্ষার আগে যে সমস্ত অধ্যায় পরীক্ষার জন্যে প্রাসঙ্গিক, তা মনে থাকার সম্ভাবনা বেশি। ছাত্রজীবনে আমরা নানান বিষয় পড়ি কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মজীবনে কাজে লাগে কেবল এমন তথ্য বা জ্ঞান আমাদের মনে থাকে। অবশিষ্ট শত-সহস্র তথ্যপঞ্জী সিলেকটিভ ফরগেটিং-এর নিয়ম মেনে আমাদের স্মৃতির পরিসর থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

৪. আবেগ — সচেতন প্রয়াসের দ্বারা তথ্য অনুধাবনের সময় গঠনমূলক আবেগের মাত্রা যত তীব্রতর হবে, তথ্যের স্মৃতি তত গভীরভাবে মনে গেঁথে থাকবে অনেকদিন।

৩) সাউণ্ড রিক্যাপিচুলেশন (Sound recapitulation) — প্রথম ধাপ গভীর অনুধাবন। পরের ধাপ স্মৃতির তথ্যভাণ্ডারে ধারণ। কিন্তু প্রয়োজন-মাফিক তথ্যগুলোকে স্মৃতির প্রকোষ্ঠ থেকে স্মরণে নিয়ে আসার ক্ষমতা অর্জন না করতে পারলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বিভ্রান্ত হতে হবে। সুতরাং এখন স্মৃতিতে থাকা তথ্যাবলী মনে আনতে হলে কী কী করতে হবে বুঝে নাও।

(ক) চাপমুক্ত পরিবেশ — চাপমুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারলে স্মৃতি প্রয়োজনমত সাড়া দেয়। মানসিক উদ্বেগ বা টেনশানের মধ্যে থাকলে স্মৃতিতে থাকা তথ্য মনে আনতে খুবই অসুবিধা হয়।

(খ) তথ্যের গভীরতা — কোনো তথ্য যদি স্মৃতির গভীরে না থাকে, তাহলে অনেক কসরৎ করে তবে তা মনে আনতে হয়।

(গ) বারবার স্মরণ — অবসর সময়ে স্মৃতিতে থাকা তথ্যপঞ্জী বারবার মনে করার অভ্যাস করতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় তা সহজে মনে পড়বে।

(ঘ) মানসিক উদ্দীপনা — বিষয় সম্পর্কে উদ্দীপনা থাকলে, পরীক্ষায় সাফল্য সম্পর্কে উৎসাহ ও পজিটিভ বিলিভিং থাকলে, মনে আনন্দ থাকলে স্মৃতিশক্তিকে সহজে কাজে লাগানো যায়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভীতি বা অনুরূপ অবস্থায় জানা তথ্যাবলীও অনায়াসে মনে আসতে চায় না।

৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মেমরি বৃদ্ধি (Increasing Student's Memory) — রুটিন-মাফিক পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনার পদ্ধতি ও সঠিক পরিবেশের দিকে নজব দিতে হবে। পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে অত্যাবশ্যকীয় কৌশলগুলি রপ্ত করতে হবে। এবং আরও অনেক কিছু যা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল।

(ক) স্টাডি টাইম — পড়াশোনা করার সঠিক সময় স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে।

১. যে সব বিষয় মুখস্ত করতে হয়, তা ভোরবেলা উঠে পড়লে ভালো।

২. কতক্ষণ পড়ছো সেটা বিবেচ্য নয়। বিবেচনা করতে হবে কত সময় তুমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশোনা করছো।

৩. নির্দিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়ে পড়লে তা স্মৃতি-সহায়ক হয়।

৪. উঁচু ক্লাসে উঠে যাবার পর মাঝরাত পর্যন্ত একটানা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলে ভালো। কারণ তখন ঘরে-বাইরে কোলাহল মুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়।

(খ). পড়ার সময় ও রুটিন — প্রত্যহ একই সময়ে পড়তে বসা অভ্যাস করো। পরিষ্কার স্পষ্ট উচ্চারণে জোরে জোরে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। লেখাপড়ার রুটিন ও গতিশীল ছন্দ স্মৃতির উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করে।

১. যার ভোরবেলা পড়লে বেশি মনে থাকে সে বেশি সময় ধরে ভোরে পড়বে। যার আবার মাঝরাতে পড়লে স্মৃতি-সহায়ক মনে হয় সে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়ার অভ্যাস করবে।

২. পড়ার সময় গল্প করবে না বা অন্যের গল্প শুনবে না।

৩. পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে গিয়ে টিভি দেখতে বসবে না।

৪. পাঠক্রমে অনেক বিষয় থাকবে। কিন্তু নিজের পছন্দের বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য বিষয়কে অবহেলা করবে না।

৫. কোনো পাঠ্যাংশ দূরূহ মনে হলে একটানা না পড়ে, অন্য পড়ার অবসরে পড়লে তা সহজে আত্মস্থ হবে।

৬. পড়তে পড়তে গান শোনার অভ্যাস ভালো নয়। খেতে খেতে বা অন্য কাজ করতে করতে পড়া স্মৃতি-সহায়ক নয়।

(গ). মানসিক অবস্থা — লেখাপড়া করার সময় সঠিক মানসিক অবস্থা স্মৃতিকে উজ্জীবিত রাখে।

১. যে বিষয় কঠিন মনে হয় তাতে ভয় না পেয়ে, অল্প অল্প করে কিন্তু বারংবার পড়তে থাকো।

২. অপছন্দের বিষয় এড়িয়ে গেলে পরীক্ষার আগে টেনশান কখনোই স্মৃতি-সহায়ক হবে না।

৩. নিজের উপর বিশ্বাস আর মনের জোর থাকলে লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) পড়াশোনার পরিবেশ — লেখাপড়ার পরিবেশ আদর্শ না হলে তা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে না।

১. শান্ত, হৈ চৈ-মুক্ত পরিবেশ এবং পড়ার ঘরে যথেষ্ট আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা থাকা চাই।

২. চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসে টেবিলে বই খাতা রেখে পড়তে হবে।

৩. আধশোয়া অবস্থায় বা চিৎ হয়ে শুয়ে কখনোই পড়াশোনা করবে না।

৪. পড়াশোনার জন্যে আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. তোমার স্টাডি টেবিল-এ লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন জিনিসপত্র রাখবে না।

৬. রাত জেগে পড়াশোনার জন্যে পড়ার টেবিলের উপরে একটি টেবিল ল্যাম্প অথবা ডিকশনারি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাতাপত্র রাখবে না।

৭. সংলগ্ন দেওয়ালে ক্লাসের রুটিন, দরকারী চার্ট বা ম্যাপ ছাড়া অন্য কোনো ছবি রাখবে না।

(ঙ)পড়াশোনার পদ্ধতি — সঠিক পদ্ধতিতে না পড়াশোনা করলে সময়ের অযথা অপচয় হবে। পাঠের স্মৃতিসহায়ক পদ্ধতিগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হল।

১. বুঝে শেখা — বিষয়বস্তু যদি অনেকদিন স্মৃতিপটে রাখতে চাও তাহলে বিষয়কে বুঝে মুখস্ত কোরো। না বুঝে মুখস্ত করার চেয়ে বারবার শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করে বিষয়কে বুঝে নিতে চেষ্টা করা ভালো।

২. সঠিক পদ্ধতিতে শেখা — সাহিত্য, বিশেষত, কবিতা, পড়ার সময় মর্মার্থ বোঝার উপর জোর না দিয়ে নির্ভুল উচ্চারণে পড়তে পারলে সহজে মুখস্থ হয়। বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় মানে না বুঝে পড়লে ভালোভাবে আত্মস্থ করা যায় না।

৩. জ্ঞানের শ্রেণীবিভাজন — শ্রেণিবিভাজিত তথ্যপঞ্জী স্মৃতিপ্রসরে যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে। একই রকমের তথ্যগুলোকে পরস্পর সাজিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করলে ফলপ্রসূ হয়।

৪. পুরো পাঠ্যবস্তু একসাথে পড়ো — যে বিষয় পড়ো না কেন, তার একটি নির্দিষ্ট অংশ একেবারে পড়ে শেষ করবে। অন্যান্য সহায়ক বইতে সেই সংক্রান্ত যা তথ্য আছে তা পড়ে নিতে ভুলো না। সমস্ত বিষয়টা গুছিয়ে পড়ে নেবার পর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আরো কয়েকবার পড়তে পারলে সেই বিষয়ের জ্ঞান স্মৃতির গভীরে গচ্ছিত থাকবে।

৫. তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করো — তথ্যকে বিষয়গত জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই তা স্মৃতির গভীরে পাকাপাকিভাবে স্থান পাবে।

৬. পড়ার পাশাপাশি লেখার অভ্যাস করো — মুখস্ত করা নানা বিষয় মাঝে মধ্যে লেখার অভ্যাস করো। লেখাপড়াতে 'পড়া' এবং 'লেখা' মনে রাখতে হবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। লেখার অভ্যাস বানান ভুল-সহ নানান ত্রুটি সংশোধন করে দিতে পারে।

৭. নিজের চিন্তাশক্তি ব্যবহার করো — তথ্যের অনুষঙ্গকে কাজে লাগাও যখন তুমি নতুন কোনো পাঠ্যাংশ পড়বে। নতুন বিষয় সম্পর্কে স্মৃতিতে থাকা পূর্ববর্তী তথ্যগুলোকে সংশ্লিষ্ট করো।

৮. ভয় পেয়ো না — কঠিন পাঠ্যবিষয় পড়ার সময় ভয় পেলে চলবে না। বিষয়কে ভালোবেসে শেখার চেষ্টা করো, সহপাঠীদের ও শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য নাও। ভয় বা উদ্বেগ কখনোই স্মৃতিসহায়ক নয়।

৯. সহায়ক গ্রন্থ — পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানান সহায়ক গ্রন্থ তোমাদের মস্তিষ্কচর্চার পরিসর বাড়াবে, যা প্রকারান্তরে স্মৃতির ব্যাপ্তিকে নিশ্চিত করে।

১০. ছবি, ম্যাপ বা চার্ট — বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ছবি, ম্যাপ বা চার্ট তথ্যকে স্মৃতিভাণ্ডারে রাখতে সাহায্য করে। মনে রাখার সুবিধার জন্যে তুমি নিজেই দরকার মত ইনফরমেশন বকস্ বা ফ্লো-চার্ট বানিয়ে নিতে পারো।

১১. চাপমুক্ত অবস্থায় পড়াশুনা করো — মানসিক টেনশান, গভীর দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ মনকে অবসন্ন করে তোলে। তখন পড়লে সহজে তা মনে থাকে না। সেল্ফ কাউন্সেলিং করে বা প্রফেশন্যাল সাইকোথেরাপিস্ট-এর সাহায্য নিয়ে টেনশান-মুক্ত হবার চেষ্টা করো। মনের বিষন্নতা কাটিয়ে উঠতে মেডিটেশান ও যোগাসনের জুড়ি নেই। ক্লাশের পড়া তৈরি নিয়ে বা আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে অযথা টেনশান কোরো না। নিজের পাঠবিষয় অনুশীলনের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে মানসিক প্রশান্তি অর্জন করো এবং তারপরে পড়ায় মনঃসংযোগ করো।

১২. পড়ার সময় এইসব করো না — মনোযোগ বিচ্যুত হয় এমন বিষয় পড়ার সময় চর্চা করবে না। যেমন, টিভি প্রোগ্রাম দেখা, গান শোনা, অন্য প্রসঙ্গ ভাবতে থাকা বা অন্যের কথাবার্তা শুনতে থাকা, ইত্যাদি।

১৩. নেমোনিক টেকনিক্ — গোলমেলে তথ্য মনে রাখার জন্য স্মৃতিসহায়ক পদ্য বা ছড়া বানিয়ে নিতে পারলে, মনে রাখার প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

১৪. ঘুম পেলে পড়া বন্ধ কোরো — পড়তে পড়তে ঘুম পেয়ে গেলে বা ঝিমুনি আসলে আর পড়া চালিয়ে গিয়ে লাভ হয় না। পড়া যদি মাথায় না ঢুকলো তাহলে শুধু শুধু রাত জেগে লাভ নেই।

১৫. পুরানো পাঠ্য বিষয় ঝালাই — আগের দিনের পাঠ্যবিষয় ঝালিয়ে নিয়ে তবে নতুন পড়া শুরু করো। পুরানো পড়া আরো একবার চোখ বুলিয়ে নিলে তা সহজেই স্মৃতিতে স্থায়ী হয়।

১৬. বিরতি নাও — পড়ায় যখন মন বসে তখন একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়ে নাও। আর যদি মন না বসে, তাহলে শুধু শুধু বই সামনে নিয়ে বসে থাকার কোনো মানে নেই।

১৭. পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা — পড়ার জন্যে নির্দিষ্ট রাখা সময়ে শুধুই পড়বে, আর খেলার টাইমে শুধু খেলবে। পড়ার সময় খেলার কথা চিন্তা করলে মনোযোগ ব্যহত হবে।

(চ) পরীক্ষার আগে কীভাবে পড়াশুনা করবে — পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগেই শেষ করে ফ্যালো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্ভাব্য পাঠক্রম। তাহলে পরীক্ষার সময় টেনশান থাকবে না। সুতরাং পরীক্ষার আগের দিনগুলো পাঠ্যবিষয় রিভিশান দিতে কাজে লাগাও। পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসবে ততই পড়াশোনার গতি বাড়াতে হবে। যে সব বিষয়ে খানিকটা পিছিয়ে আছো, সেগুলোর জন্যে একটু বেশি সময় বরাদ্দ রাখো। নিচে পরীক্ষার আগে পড়াশোনা করার সময় কি করবে আর কি করবে না, তা সংক্ষেপে, পয়েন্ট আকারে দেওয়া হল।

১. বিষয় নির্বিশেষে সমান গুরুত্ব দিয়ে লেখা বা পড়া করতে হবে।

২. পড়ার সময় প্রত্যেকটা দিন ব্যবহার করতে হবে সুষ্ঠভাবে।

৩. অঙ্ক বা ইংরাজী কঠিন বলে এড়িয়ে না গিয়ে গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে।

৪. পরীক্ষার অনেকদিন আগেই সমস্ত সিলেবাস শেষ করে নেবে। তারপরে শুরু করবে বিষয়ভিত্তিক রিভিশান।

৫. প্রত্যেক বিষয়ের সম্ভাব্য সব ধরণের প্রশ্ন মুখস্ত করে নেবার পর লিখে তৈরি করে রাখবে।

৬. পাঠ্যবিষয় মনে থাকছে না ভেবে অযথা টেনশান করবে না।

৭. পরীক্ষার প্রস্তুতি যথাযথ হয়নি বলে একনাগাড়ে রাত জেগে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে না। একবার শরীর অসুস্থ হলে অনেক বেশি পড়ার সময় অপচয় হবে।

৮. পরীক্ষার আগে পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে মনের চাপ বাড়াবে না।

৯. ঘুম, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নেবে না।

১০. প্রশ্নের উত্তরের সাথে সম্ভাব্য ম্যাপ বা ছবি থাকলে, তা পরীক্ষার আগেই যথাযথভাবে অভ্যাস করে নেবে।

(ছ) পড়াশোনার টাইম ম্যানেজমেন্ট — সময়কে সময়ে কাজে না লাগালে তোমার জীবনে অসময় আসবেই। সময়, মনে রেখো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহারের বিদ্যা রপ্ত করতে না পারলে, পরীক্ষার আগে অযথা

টেনশান করতে হবে। শুধু প্রখর স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে লেখা যায় না, তার জন্যে দরকার হয় সময় ব্যবহারের দক্ষতা। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার আবশ্যিক শর্ত হল পাঠ্যবিষয় বারবার লেখার অভ্যাস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান আর সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার ক্ষমতা। এবার দেখে নাও সারা বছর ধরে কেমন করে পড়বে, পরীক্ষার আগে কিভাবে প্রস্তুতি নেবে আর পরীক্ষার হলে কিভাবে করবে টাইম-ম্যানেজমেন্ট।

১. বছরের প্রথম দিকে সময় অপচয় করা চলবে না। শিক্ষাবর্ষের আরম্ভ থেকে পুরোদমে পড়াশোনা না করলে শেষে অযথা টেনশান করতে হবে।

২. যেদিনের পড়া সেদিনই পুরোটা তৈরি করে নাও পরের দিনের জন্যে ফেলে রাখবে না।

৩. সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস করো। সকালবেলার পড়া স্মৃতি সহায়ক হয়।

৪. রাতের ঘুম, স্কুলের টাইম আর খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে যতটা সময় অবশিষ্ট থাকে, তার সিংহভাগ লেখাপড়ার জন্যে বরাদ্দ রাখতে চেষ্টা করো।

৫. পড়ার টাইমের একটা সুনির্দিষ্ট রুটিন বানাও। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় পড়ার অভ্যাস রেখো।

৬. পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছে এমন প্রশ্ন শুরুতে উত্তর লিখবে না।

৭. পড়তে পড়তে বারংবার পড়ার টেবিল থেকে উঠে গেলে সময়ের অপচয় হয় অযথা।

৮. সব থেকে ভালোভাবে মুখস্ত হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তর আগে লিখে নিও।

৯. ভাল জানা নেই এমন ধরনের প্রশ্ন শেষের দিকে সময় থাকলে তবেই উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।

১০. না-জানা প্রশ্নের উত্তর বানিয়ে লিখে মূল্যবান সময় অপচয় করবে না।

১১. পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা বাজার দশ মিনিট আগে সব উত্তর লেখা শেষ করে নেবে। বাকী সময়টুকু দ্রুত চোখ বুলিয়ে দরকারী সংশোধনের জন্যে বরাদ্দ রেখো।

(জ) পড়াশোনায় মনঃসংযোগ বাড়ানোর উপায় — অনেক ছাত্র-ছাত্রী খুব অনায়াসে পড়াশোনায় মন বসাতে পারে, অনেকে আবার পারে না। তাদের মন বিক্ষিপ্ত হয় নানাবিধ কারণে। শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। স্বাভাবিক নিয়মে পাঠগ্রহণ কালে মানসিক সক্রিয়তা মনোযোগ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসতে পারে না। এ বিষয়ে কী কী করণীয় তা নিচে আলোচনা করা হল।

১. নন-ভলিশন্যাল অ্যাটেনশন — ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার উপযোগী, বিদ্যালয়ের প্রতি যথাযোগ্য সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে পারলে তারা আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২. তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্বের মুখমণ্ডল কল্পনা করো — চোখ বন্ধ করে বসে মনঃসংযোগ করার জন্য তোমার জীবনের সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখমণ্ডল কল্পনা করার চেষ্টা করো। নমস্য শ্রদ্ধেয় মানুষটির শিক্ষা-সংক্রান্ত সাফল্য তোমাকে অনুপ্রাণিত করবে।

৩. অ্যাবস্ট্রাকট ভলিশন্যাল অ্যাটেনশন — ইচ্ছাধীন মনোযোগের বিকাশ ঘটাতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে হবে। কালক্রমে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের মত কাজ করবে এবং বাকী জীবনে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে।

৪. মোমবাতির শিখা কল্পনা করো — চোখ বন্ধ করে তোমার চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি কল্পনা করো। মনঃসংযোগ করে অনেকক্ষণ মোমবাতির শিখাটাকে মনশ্চক্ষে প্রজ্জ্বলিত রাখো।

৫. মনোযোগের বিস্তার — মনোযোগ দিতে হবে এমন বিষয়বস্তুর সংখ্যা যদি খুব বেশি হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্রভাবে সবকিছুর উপর নজর দিতে পারবে না। সেজন্য মনোযোগের পরিসরকে কখনোই তোমার ব্যক্তিগত সীমার বাইরে যেতে দিও না।

৬. ভিসুয়ালাইস ডিজিট ফরওয়ার্ড এণ্ড ব্যাকওয়ার্ড — চোখ বন্ধ করে মনে মনে এক থেকে পঞ্চাশ গুনতে থাকো। এবং তারপর উলটোদিক থেকে গুণে শূন্য পর্যন্ত কল্পনায় দ্যাখো।

৭. টিচিং এইডস্ — বস্তুর তীব্রতা ও স্পষ্টতা মনোযোগ আকর্ষণ করে। পাঠ্যবিষয় হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে তাই শিক্ষামূলক নানাবিধ জিনিসের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৮. রিল্যাকসেশন টেকনিকস্ — যোগাসন ও মেডিটেশান থেকে নানান কায়দা রপ্ত করে পাঠে মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্যে রিল্যাকসেশন-র পদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করো।

Chapter -- 4

আমরা শেখা জিনিস ভুলে যাই কেন

১) **ইমশোন্যাল ব্লকিং** (Emotional blocking) — ঘৃণা, রাগ, ক্রোধ ইত্যাদি নেগেটিভ ইমোশন-গুলো আমাদের মনন-ক্রিয়ায় এমন মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার প্রভাবে ভালো করে মুখস্ত করা পাঠ্যবিষয়ও আমরা স্মরণ করতে পারি না। কোনো ব্যক্তি জীবনে প্রথম অভিনয় করার সময় নাটকের সংলাপ ভালো করে আয়ত্ব করা সত্ত্বেও স্টেজ-ফ্রাইট বা মঞ্চভীতির জন্যে, তার নাটকের সংলাপ ভুলে যেতে পারে। সেজন্যে সবসময় ইমোশন্যালি ব্যালেন্সড থাকতে হবে।

২) **ল্যাক অফ রিভিউ** (Lack of review) — পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্যে তা কিছুদিন অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করা জরুরী। কোন পাঠ্যাংশ আয়ত্ত করার পর যদি না তা নিয়ে আর চর্চা বা আলোচনা করা হয়, তাহলে তা ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩) **শক অ্যামনেসিয়া** (Shock amnesia) — মস্তিষ্কের আঘাত লাগার জন্যে মানুষ অনেককিছু ভুলে যায়। দুর্ঘটনা, খেলাধূলা-জনিত আঘাত বা যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরনের শব্দ মানবমনে শক অ্যামনেসিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তেমনটা ঘটলে নিউরো সাইকিয়াট্রিস্ট-এর চিকিৎসায় যথাশীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠতে হবে।

৪) **রিপ্রেশান** (Repression) — আবেগের বিপর্যয় এড়ানোর জন্যে আমরা জীবনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা সচেতনভাবে ভুলে যেতে চাই। নিজের কৃত অপরাধ বা সম্মানহানিকর কোনো ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের সচেতন সত্তার কাছে নিদারুণ পীড়াদায়ক বলে আমরা তা বিস্মৃত হতে চাই।

৫) **ওয়াণ্ট অফ ভার্বাল অ্যাসোসিয়েশন** (Want of verbal association) — বাচনিক অনুষঙ্গ বা উপযুক্ত ভাষার অভাবে আমরা অনেককিছু ভুলে যাই। ভাষার অভাবের জন্য শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা আমরা পরবর্তী জীবনে স্মরণ করতে পারি না।

৬) **রেট্রোঅ্যাকটিভ ইনহিবিশন** (Retroactive inhibition) — কোনো পাঠ্যাংশ আত্মস্থ করার অব্যবহিত পরেই অন্য একটি ভিন্ন বিষয় শিখতে গেলে দ্বিতীয় বিষয়টির শিক্ষণ প্রথম বিষয়টির সংরক্ষণকে বাধা দেয়। ফলে প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষ আমরা ভুলে যেতে থাকি। তোমরা সুতরাং দুটি বিভিন্ন বিষয় শেখার মধ্যে সময়ের দিক থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখার চেষ্টা কোরো।

৭) **ল্যাক অফ অ্যাসোসিয়েশন এণ্ড সাজেশন** (Lack of association and suggestion) — অনুষঙ্গের প্রভাবে আমাদের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত। অতএব বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদি উপরিউক্ত অনুষঙ্গের অভাব ঘটে তাতে একটি ঘটনা অভিভাবন প্রক্রিয়া দ্বারা আর একটি ঘটনাকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের সেজন্যে সর্বদা মনে রাখা উচিত, উপযুক্ত অনুষঙ্গ আর অভিভাবনের অভাবে বিস্মৃতি ঘটতে পারে।

৮) **ফিনিশড ওয়ার্ক কসেস ফরগেটফুলনেস** (Finished work causes forgetfulness) — যদি কোনো কাজ সম্পূর্ণভাবে করা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেই সংক্রান্ত তথ্য আমরা সহজেই ভুলে যাই। সম্পূর্ণ করতে হবে এমন কাজ সম্পর্কে কদাচিৎ আমাদের বিস্মৃতি ঘটে। সেজন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিৎ সর্বদা প্রসেস অফ সাকসেস-এর মধ্যে থাকা।

৯) **চেঞ্জ অফ এণভায়রনমেণ্ট** (Change of environment) — ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশের পরিবর্তন হলে আমরা শেখা জিনিস বিস্মৃত হই। একটি ছাত্র ঘরে বসে একটি পাঠ্যবিষয় শিখে নির্ভুলভাবে তার উত্তর দিতে পারে, সে-ই ছাত্রই আবার স্কুলের ক্লাশে বা পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে পাঠ্যবিষয় ভুলে যায়। এমনটা অনেক ভালো ছাত্রদের ক্ষেত্রেও হতে দেখা গেছে। আপনি সুতরাং আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটলে, তাকে অযথা বকাঝকা করবেন না।

১০) **কনসিউমিং অ্যালকোহল** (Consuming alcohol) — শরীর যদি অসুস্থ থাকে বা মস্তিষ্ক যদি ক্লান্ত থাকে, তাহলে আমরা কোনো কিছু স্মরণ করতে চাইলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়টাকে স্মরণে আনতে পারছি না। দীর্ঘকাল ধরে মদ্যপানে আসক্ত থাকলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে বিস্মৃতির কারণ হতে পারে। সতর্কবাণী: ছাত্রজীবনে কদাচ সিগারেট মদ বা অন্য কোনো নেশার সামগ্রী সেবন করা উচিত নয়।

Chapter -- 5

সহজে শিখণের পদ্ধতি ও স্পীড-রিডিং পদ্ধতি

সহজে শিখণের পদ্ধতি

১) **স্পেসড রিপিটেশন** (Spaced repetition) — একনাগাড়ে একটি পাঠ্যাংশ শেখার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধানে পুনরায় সেটি পাঠ করা যায়, তাহলে সহজেই বিষয়টিকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা যায়। আমরা জানি, একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সামান্য বিশ্রাম পেলে ব্রেণ-এর ওয়ার্ক পাওয়ার বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বিষয়বস্তুটি মনে রাখা সহজসাধ্য হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বলছি, একটি পাঠ্যাংশ একেবারে মুখস্ত করার চেষ্টা না করে যদি পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে দিনে দু'-একবার করে পড়া যায় তাহলে তা স্মৃতিতে রাখা সহজ হবে।

২) **লজিক্যাল মেথোড** (Logical method) — মর্মার্থ না বুঝে শুধুমাত্র মুখস্ত বিদ্যার দ্বারা কোনো বিষয় আত্মস্থ করা যায় না। পাঠ্যাংশের অর্থ না বুঝে মুখস্থ করলে বিষয়বস্তুর সাথে অন্যান্য ভাবের কোনো অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় না। পাঠ্য বিষয়বস্তুর ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, অন্য ভাবের সাথে তার লজিক্যাল রিলেশন ও কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে বিষয়টি শিখলে তা দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে।

৩) **মোড অফ রিসাইটেশন** (Mode of recitation) — কোনো বিষয়কে মনে স্থায়িত্ব দিতে হলে আবৃত্তি খুবই কার্যকরী মাধ্যম। একটি পাঠ্যাংশ অনেকবার পড়লে তা দৃঢ়ভাবে মনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু বেশ কয়েকবার পড়ার পর পাঠ্যপুস্তক না দেখে তা আবৃত্তি করলে বিষয়টি অধিকতর স্থায়ীভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীদের বলছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোনো বিষয় পাঠ করার পরে সঠিকভাবে তা মুখস্ত হয়েছে কিনা জানার জন্য অ্যাকটিভ রিকল মেথোড প্রয়োগ কোরো।

৪) **সমগ্র ও আংশিক অবধারণ পদ্ধতি** (Whole versus part learning) — সাধারণভাবে সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী। কারণ এই পদ্ধতিতে একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশ অনুষঙ্গ রূপে শিক্ষা করা যায়। তবে যে সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই, পার্ট লার্নিং মেথোড ভালো ফল দেয়।

৫) **শেখার ইচ্ছা** (Intention to learn) — আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোকিছু শেখার চেষ্টা করলে তা যথারীতি ফলপ্রসূ হয় না। কোনো কিছু শেখার জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তা আয়ত্ব করার চেষ্টা করলে সহজেই তা সম্ভবপর হয়।

৬) **ওভার লার্নিং ও রিভিউ** (Overlearning and review) — যতবার পড়লে একটি পাঠ্যাংশ নির্ভুলভাবে মুখস্ত করা যায়, তার থেকে আরো কয়েকবার বেশি পাঠ করলে তা সহজে আত্মস্থ হয় ও দীর্ঘকাল স্মৃতিতে থাকে। এছাড়া শেখা পাঠ্যাংশটি মাঝে মধ্যে রিভিউ বা পর্যালোচনা করলে, তা খুবই স্মৃতি-সহায়ক হয়।

৭) **শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি** (Classification method) — যে বিষয়কে শিখতে হবে তা শ্রেণিবদ্ধ করে শিখলে সেটি সহজে স্মরণ রাখা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৩৬, ৪৬, ৫৬, ৬৬ সংখ্যাকে যত সহজে মনে রাখা যাবে, ৬৩, ৪৭, ৩৯, ৮১ সংখ্যাগুলোকে তত সহজে মনে রাখা যাবে না।

৮) **স্মৃতি-সহায়ক কৌশল** (Techniques for aiding memory) — নানাবিধ স্মৃতি-সহায়ক কৌশলের সাহায্যে যেসব ঘটনাসমূহের মধ্যে আঙ্গিক সম্পর্ক নেই তা এখন সহজে মনে রাখা যায়। প্রথিতযশা দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল সম্পর্কে শোনা যা, তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন কথাপ্রসঙ্গে একজন মার্কিন সাংবাদিককে বলেছিলেন যে, তাঁর বাড়ির নাম্বার ১৪১৪, এবং এই নাম্বার স্মরণ করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না, কারণ ২ সংখ্যাটির বর্গমূল হল ১.৪১৪। মিস্টার রাসেল ২ সংখ্যার বর্গমূলের মাধ্যমে তাঁর বাড়ির নাম্বার মনে রাখতেন। স্মৃতি-সহায়ক এই জাতীয় কৌশলগুলির মধ্যে একটা নতুনত্ব আর কৌতুকের উপাদান থাকে বলে, এগুলি কার্যকরী হয়।

স্পীড-রিডিং পদ্ধতি

১. এরগোনমি-এর নীতি মেনে পড়াশোনার সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা বিভ্রান্ত হয়।

২. পড়ার গতি বাড়ানোর জন্যে বইয়ের লাইনের উপর পেনসিল বা আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে যেতে হবে। এভাবে পড়লে চোখের অবস্থান চ্যুত হয় না।

৩. জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে মনে পড়া মনঃসংযোগের বিচ্যুতি ঘটায়।

৪. বিশেষভাবে মনে রাখার জন্যে পড়ার সময় প্রয়োজনীয় শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ ফ্লুরোসেন্ট মার্কার দিয়ে আণ্ডারলাইন করে দাগ দিয়ে রাখতে পারো।

৫. পাঠ্যবিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝে নেবার জন্যে বই বা খাতার মার্জিনে পেনসিল দিয়ে দরকারি নোট লিখে রাখতে পারো।

৬. কম সময়ে অনেক বেশি তথ্যকে জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চয় করতে হলে স্পীড-রিডিং খুবই কার্য্যকরী পদ্ধতি।

Chapter -- 6

শিখণ-ক্রিয়ার সমস্যার সমাধান

১) যখন পড়বে অন্যকিছু মাথায় আনবে না, পড়াটা শেষ করার জন্যে চূড়ান্তভাবে মনঃসংযোগ করবে।

২) যে বিষয়ে তুমি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সেই বিষয়ে বেশি সময় ও মনোযোগ দিয়ে পড়ো। নিজের পড়ার কৌশল যদি স্মৃতি-সহায়ক না হয়, তাহলে মেধাবী সহপাঠী বা শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে পরামর্শ নিয়ে তা নতুন করে বিকশিত করো।

৩) ক্লাশে পড়া শুনতে শুনতে শিক্ষক মহাশয় দরকারী যা যা বলছেন তার নোট নেবে। এবং পরে তা অন্যান্য বই কনসাল্ট করে সুন্দর নোট আকারে বানিয়ে নেবে প্রত্যেকদিন।

৪) সুনির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় চর্চা করার অভ্যাস করো। পড়াশোনার টাইম ম্যানেজমেণ্ট তোমার অনেক মূল্যবান সময় অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।

৫) বইয়ের দরকারী তথ্য সহজে মনে রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় লাইনগুলো আণ্ডারলাইন করে রাখতে পারো।

৬) কোনো পাঠ্যাংশের অংশবিশেষ একসময়ে পড়ে, পরে আবার বাকি অংশ পড়লে স্মৃতিতে সবটা ধারণে অসুবিধা হয়। বরঞ্চ সমগ্র পাঠ্যবিষয়টি (যেমন, কবিতা, ইত্যাদি) একসাথে মুখস্ত করার চেষ্টা করো।

৭) সাধারণ নিয়মনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করার সময় নিজের তৈরি যথাযথ উদাহরণের নিরিখে তা করার চেষ্টা করো।

৮) শরীর ভালো না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। শারীরিক স্বাস্থ্য অবহেলা করলে অনেক মূল্যবান পড়ার দিন অপচয় হবে।

৯) দিনের পড়া দিনের দিন করে রেখো, পরের দিনের জন্যে ফেলে রেখো না। মনে রেখো, সময় কিন্তু তোমার জন্য বসে নেই।

১০) অঙ্কের ফর্মুলা, ইতিহাসের দিনক্ষণ বা যে কোনো ধরণের টেকনিক্যাল টার্ম-গুলো মনে রাখার জন্যে কিছুদিন অন্তর অন্তর রিভিশান দেবে।

১১) কখন কি কাজ করবে সে ব্যাপারে নিজস্ব একটা রুটিন করে রাখবে। বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করে পড়াশোনায় মোটিভেশন আনা যায়।

১২) তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে না পারলে স্মৃতির পরিসরে তা দীর্ঘদিন থাকবে না। কোনো কিছু শিখনের জন্যে তাই সাধারণ জ্ঞানের চর্চা জরুরী।

১৩) শেখার ও আত্মস্থ করার মানসিকতা নিয়ে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে মন দিয়ে ডুবে যাও। তোমরা নিশ্চয়ই অর্জুনের পাখির চোখের গল্পটা সবাই জানো।

১৪) পড়ার ঘরের বাহ্যিক পরিবেশ, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, স্টাডি-টেবিল ইত্যাদি যথাযথ হওয়া দরকার যাতে সহজে পাঠে মনোনিবেশ করা যায়।

১৫) নানাধরণের শারীরিক খুঁত মানসিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যেমন— কানে শোনার সমস্যা, দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীদের এই ধরনের দৈহিক খুঁত থাকলে তা চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে যথাশীঘ্র।

১৬) একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা ঘরে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস করলে, তা পাঠে মন বসাতে সহায়ক হয়।

১৭) নতুন পাঠ্যাংশ পড়তে শুরু করার আগে অবশ্যই তোমরা পুরানো পড়াগুলো ঝালাই করে নেবে।

১৮) কোনো একটি বিশেষ পাঠ্যবিষয় মুখস্ত করার জন্যে যদি তথ্যের অনুষঙ্গের সাহায্য না পাও, তাহলে তোমাকে নিজের মত করে কৃত্তিম কোনো পদ্ধতি রপ্ত করে নিতে হবে যাতে তুমি ঐ পাঠ্যাংশ সহজে মনে রাখতে বা যখন যেমন প্রয়োজনে চটজলদি স্মরণ করতে পারো। চার্ট, ম্যাপ বা ছবি ইত্যাদি অনেককিছুর সাহায্যে তুমি এটা করতে পারো।

১৯) মনে রাখতে হবে, তুমি তোমার নিজের জ্ঞান অর্জন করার জন্যে পড়াশোনা করছ, শিক্ষকমহাশয়দের জন্যে নয়। একজন ভালো শিক্ষক কেবল তোমার জ্ঞানপিপাসাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন। আত্ম-নির্ভরতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তুমি তোমার পড়াশোনায় উন্নতি করো। আর তোমার নিজের উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে যেন তোমার স্বচ্ছ ধারণা থাকে। তবেই তুমি তা অর্জন করার জন্য যা যা করা দরকার, শিক্ষাজীবনে তুমি তা মনঃসংযোগ দিয়ে করতে পারবে।

২০) একই জিনিস একটানা অনেকক্ষণ ধরে পড়বে, যাতে তোমার শিখণ-প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। কিন্তু আবার সেই জিনিস এত বেশিক্ষণ ধরে পড়বে না যে তা খুব ক্লান্তিকর মনে হয়।

২১) নিঃশব্দে পড়ার চেয়ে জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়লে, তা সহজে মনে থাকে। উচ্চারণ করে পড়লে পাঠের জড়তা কেটে যায় আর উচ্চারণেও স্বচ্ছতা আসে। তাছাড়া ধীরে না পড়ে দ্রুতগতিতে পড়লে পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

Chapter -- 7

ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানোর উপায়

দ্রুত মনে রাখার কৌশল

(ক) **স্পিড রিডিং** — দ্রুত পড়লে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে তথ্য রিসিভ করা ও তা রিটেন করা দ্রুততর হয়। পারম্পর্য রক্ষা করে তথ্য মনের মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারলে স্পিড লার্নিং-এর সুফল হাতে-নাতে পাওয়া যায়।

(খ) **আবেগঘন উপস্থাপনা** — পাঠ্যবিষয়ের উপস্থাপনা যদি আকর্ষক হয় আর ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনমূলক আবেগের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে সেই পাঠ্যাংশ স্মৃতিতে অনেকদিন স্থায়ী হয়।

(গ) **দৃশ্যমান চিত্রকল্প** — পাঠ্যাবিষয়ের সাথে সম্পর্কিত চিত্র বা চিত্রকল্প শিক্ষার্থীকে স্মৃতির মণিকোঠায় তা তুলে রাখতে সাহায্য করে। একটা বিষয় বোঝাতে গেলে অজস্র শব্দ ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু ছোট্ট একটা ছবি দিয়ে তা সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

(ঘ) **ইনিউমারেশন, নেমনিকস্ ও গ্রুপিং** — তথ্যকে স্মৃতি-ভাণ্ডারে ধরে রাখার কৌশল, স্মৃতি-সহায়ক ছড়া, ইত্যাদি হল নেমনিকস। আর ইনিউমারেশন হল সংশ্লিষ্ট তথ্যপুঞ্জ স্মৃতির আলমারিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকায় সংরক্ষিত রাখা। সবশেষে, সাজানো তালিকা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে মেমরি স্প্যান-এ সাজিয়ে নেওয়া, যাকে আমরা গ্রুপিং বলি। এই তিনটি বিষয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইনফরমেশন যদি যুক্ত হয়, তবেই একমাত্র স্পিড লারনিং-এর উপকারিতা প্রত্যক্ষ হয়।

(ঙ) **মেণ্টাল ম্যাপ** — পাঠ্যবিষয়ের নির্যাস শিক্ষার্থীর মনের মানচিত্রে আকর্ষক ছায়াছবির আদলে রূপদান করা গেলে তা স্মৃতি-সহায়ক হয়।

(চ) **একই ধরণের টপিক একসাথে পড়বে না** — সমগোত্রীয় দুটি জিনিস একসাথে শিখতে চেষ্টা করলে, একটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্যটির অনুষঙ্গ মিশে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করে।

(ছ) **লঘু সঙ্গীত শোনো** — অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তার পছন্দের সংগীত চালিয়ে একমনে অঙ্ক করতে দেখা যায়। এছাড়া, কঠিন বিষয় পড়ার ফাঁকে অবসর সময়ে কিছুক্ষণ লঘু-সঙ্গীত শুনলে মনের রিসেপটিভ পাওয়ার তীব্র হয়।

(জ) **অ্যাট্রাকটিভ পিকটোরিয়াল প্রেজেনটেশন** — শিক্ষার্থীদের বিষয়-ভিত্তিক উৎসাহ বৃদ্ধি করতে আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ্যবিষয়কে পরিবেশন করতে হয়। যে সকল শিক্ষক 'ড্রামাটিক ওয়ে অফ টিচিং' মেথড অনুসরণ করেন, তাঁরা ছাত্রমহলে খুবই জনপ্রিয় হন।

Chapter -- 8

কোন্ কোন্ খাবার খেয়ে মেমরি ও ব্রেন পাওয়ার বাড়ানো যায়

স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপকারী খাদ্যসামগ্রী

১. ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড (Omega-3 Fatty Acid) — মস্তিষ্কচর্চার জন্যে চাই শক্তিশালী ব্রেন। আর ব্রেনের এনার্জি-ফুড হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড । যত ধরণের ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, তাদের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড-ই মানবদেহের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে মেমরি পাওয়ার বৃদ্ধি করার জন্য। মিঠা জলের কাতলা-রুই প্রভৃতি পোনা মাছে এবং সার্ডিন, পমফ্রেট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক নোনা মাছে (deep sea fish) পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এই ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল DHA, যা ব্রেনের সেল মেমব্রেন-এর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে বাচ্চাদের ব্রেণ ডেভেলপমেণ্ট-এ কার্যকরী ভূমিকা নেয় ও বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিকে সতেজ রাখে।

২. অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট সমৃদ্ধ খাবার (Anti-Oxidant Enriched Foodstuffs) — মেমরি পাওয়ার বাড়াতে হলে যে সব খাবারে প্রচুর পরিমাণে অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট আছে সেগুলো খেতে হবে। কারণ অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট ব্রেনে অকসিজেন সরবরাহে সাহায্য করে আমাদের মেমরি অ্যাকটিভিটি বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া এটা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ফ্রি রেডিক্যালস গুলোকে ধ্বংস করে দেহের নিউরোট্রান্সমিশন সিস্টেম-কে চাঙ্গা রাখে। যে সব খাবারে অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তা হল — ফুলকপি (Broccoli), ট্যামাটো, পাতাযুক্ত সবুজ শাক-সব্জী (Green Vegetables), রসুন (Garlic), বিন (Red Kidney Beans), স্ট্রবেরি (Strawberries), ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন ফল যেমন, আমলকি, খেজুর, কিসমিস, আঙুর প্রভৃতিতে খুবই উন্নতমানের অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট পাওয়া যায়।

৩. মাছের তেল (Flakes Seed Oil or Fish Oil) — সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ১ চামচ করে তিসির তেল বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। পাওয়া গেলে মসীনা বা শন তৈলও খাওয়ান। এসব তেল সহজলভ্য না হলে পরিবর্তে ৫০০ মিগ্রা মাছের তেল খাওয়ানো খুবই জরুরী। বুদ্ধি ও মেধার বিকাশে এইসব তেল অব্যার্থ।

৪. ফাইটোকেমিক্যাল (Eat Memory-boosting Phytochemicals) — কিছু কিছু ফাইটোকেমিক্যাল আছে যারা স্মৃতিহ্রাস আটকাতে সাহায্য করে। অ্যাস্থোসায়ানিন নামেব একটি ফাইটোকেমিক্যাল আছে যে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, মেমরি পাওয়ার ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে দারুণ সহায়তা করে। ব্লু-বেরি থেকে আমরা অ্যানথোসায়িানিন পেয়ে থাকি। সেজন্যে ব্লু-বেরি কে বলা হয় মেমরি বুস্টিং পাওয়ার হাউস।

৫. ভিটামিন, মিনারেল ও ফলিক অ্যাসিড

(ক) ভিটামিন-ই এর মধ্যেকার যৌগ টোকোফেরল আর টোকোট্রিয়েনল-এর মধ্যে অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট-এর গুণ আছে যা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

(খ) পাইরিডকসিন — এই ভিটামিন থেকে উৎপন্ন কো-এনজাইম পাইরিডকসাল ফসফেট ব্রেন-এর অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানবমস্তিষ্কের বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

(গ) মিনারেল — নির্দিষ্ট কয়েকটি মিনারেল, যেমন সেলিনিয়াম, ইত্যাদি ব্রেনে অকসিজেন সরবরাহে সাহায্য করে।

(ঘ) ফলিক অ্যাসিড — মানবদেহের ব্রেন মেটাবলিজিম-এ ফলিক অ্যাসিডের ভূমিকা অনবদ্য।

৬. মেমরি সেল উৎপাদনকারী লিসিথিন (New Memory Cell-producing Lecithin) — প্রমাণিত হয়েছে, লিসিথিন নতুন মেমরি-সেল তৈরি হতে সাহায্য করে। ডিমের কুসুম (Egg-yolk) ও সোয়াবিনে প্রচুর পরিমাণে লিসিথিন থাকে।

৭. জিঙ্কো বাইলোবা ও জিনসেং (Ginko Biloba and Ginseng) — এই দুটি ভেষজ ব্রেনের গ্লুকোজ মেটাবলিজমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং স্মৃতি প্রসরকে বাড়িয়ে আমাদের মেন্টালি এ্যালার্ট করে রাখে। জিংকো বাইলোবা মস্তিষ্কে Oxygen জোগান দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও জিনসেং ব্রেনের নার্ভের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

৮. এল-গ্লুটামিন ও গোটু কোলা (El-Glutamine and Gotu Kola) – এল-গুটামিন আমাদের মস্তিষ্কের জ্বালানি (brain charger) হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও এটা আমাদের শরীর থেকে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া তুলে নিতে সাহায্য করে, যে অ্যামোনিয়া মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটায়। আর আমাদের দেশের ভেষজ গোটুকোলা ব্রেনের একটি পুষ্টিকর খাদ্য এবং এটা মানসিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

৯. ফিনাইলঅ্যালনিন ও ফসফোলিপিড (Phenylalanine and Phospholipids) – ফিনাইল অ্যালানিন এমন একটা অ্যমাইনো অ্যাসিড যা আমাদের ব্রেনের কয়েকটা নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করে। যেগুলো থেকে উৎপন্ন নর-এপিনেফ্রিন আমাদের মেন্টাল এ্যালার্টনেস বাড়াতে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, ফিনাইল অ্যালানিন ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার ক্ষমতা এবং তা দীর্ঘকাল মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে ফসফোলিপিড ব্রেন-এর সেলুলার ডেভেলপমেন্ট-এ অংশগ্রহণ করে। সেফালিন ও ফসফাটিডিলসারিন নামক দুটি ফসফোলিপিড নতুন নতুন মেমরি সেল তৈরিতে সাহায্য করে।

১০. এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড – বুদ্ধি-মেধার বিকাশ ও স্মৃতিশক্তির বিস্তারের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো খুবই জরুরী। এছাড়া, নানান ভিটামিন, কপার, জিংক, আয়রণ, আয়োডিন প্রভৃতি মস্তিষ্কচালনার জন্যে দরকারী। আর দরকার ছটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এসেনসিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যাদের নাম ডেকোসা হেক্সাওনিক অ্যাসিড (ডি এইচ এ) ও ইকোসা পেণ্টায়োনিক অ্যাসিড (ই পি এ)।

১১. ফাংশনাল নিউরোট্রান্সমিটার – যথাযথ ব্রেণ ফাংশানের জন্যে সেরোটোনিন, ডোপামিন,অ্যাসিটাইল কোলিন আর গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড (জিএবিএ)-এর মত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিউরোট্রান্সমিটার-গুলোর নির্ধারিত মাত্রায় জোগান থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এইসব নিউরোট্রান্সমিটারগুলো মানব মস্তিষ্কে এক স্নায়ুকোষ থেকে আরেক স্নায়ুকোষে নার্ভ-ইমপালস বয়ে নিয়ে যায় - যা বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি ও হায়ার কগনিটিভ ফাংশানকে সুচারুভাবে সম্পাদিত হতে সহায়তা করে। আমাদের খাদ্য তালিকায় বিশেষ কিছু খাবার আছে যেগুলো এইসব নিউরোট্রান্সমিটারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরাসরি সাহায্য করে। সেরোটোনিনে স্মৃতিশক্তি ও স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার শক্তি বাড়ে। শরীরে এর মাত্রা যথাযথ পরিমাণে থাকলে ঘুম খুব ভালো হয়। ব্রাউন রাইস, হোল-হুইট ব্রেড, স্যামন, ছানা, কলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে সেরোটোনিন পাওয়া যায়। ডোপামিন মস্তিষ্কে এনার্জি সরবরাহ করে শিখন-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ও মনোনিবেশ ক্ষমতা বাড়ায়। কুমড়ো বীজ ও মটরশুঁটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডোপামিন পাওয়া যায়। অ্যাসিটাইল কোলিন আমাদের ব্রেণকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে ও স্মৃতি-প্রসর বাড়ায়। মাছের মুড়ো, ডিমের কুসুম, পিনাট ইত্যাদি অ্যাসিটাইল কোলিনের সমৃদ্ধ উৎস। আমাদের স্নায়ু-তরঙ্গে রিদিমিক মুভমেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে গাবা বা গামা অ্যমাইনো বিউটারিক অ্যাসিড। আনারস, লেবু, সবুজ শাক, ক্যাপসিকাম, বাদাম ও ওটমিল-এ প্রচুর পরিমাণে গাবা (GABA) পাওয়া যায়।

১২. সাম স্পেশ্যাল ফুডস্ –

ক) ব্রকোলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি – বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিহ্রাস থেকে প্রতিকার পেতে ক্রুসিফেরাস গ্রুপের এইসব কপি খাবার হিসাবে অনবদ্য। এসবে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-কে ও সমৃদ্ধ অ্যাণ্টি-অক্সিড্যাণ্ট থাকে, যা ব্রেণ-সেল এর সক্রিয়তা রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে সাহায্য করে।

খ) কুমড়ো বীজ ও অ্যাভোকাডো – চিন্তাশক্তির প্রখরতা বাড়াতে ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের জন্যে জিংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুমড়ো বীজ-এ প্রচুর মাত্রায় জিংক আছে। আর অ্যাভোকাডো, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মোনো আনস্যাচ্যুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, আমাদের ব্রেণ-এ ব্লাড সার্কুলেশানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গ) মাশরুম, সয়াবিন, মটরশুঁটি – মটরশুঁটিকে ডায়েটে রাখলে প্রোটিন, আয়রন ও ফলিক অ্যাসিডের ভাণ্ডার পেয়ে যাবেন - যা বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশে ও মস্তিষ্কে কোষসমূহের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ বাড়াতে অপরিহার্য। সয়াবিনে থাকে টাইরোসিন নামের একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড – যা নিউরোট্রান্সমিটার হিসাবে কাজ করে মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করে, চিন্তার বিস্তার ঘটায় ও বুদ্ধিকে প্রখরতর করে। এছাড়া, সয়াবিনে প্রাপ্ত ফাইটোস্ট্রোজেন, আয়রণ, কপার, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-ই ইত্যাদি ব্রেণ-পাওয়ার বাড়াতে দারুণ উপকারী। আর সেলিনিয়াম, পটাসিয়াম, নিয়াসিন ও রাইবোফ্ল্যাভিন সমৃদ্ধ মাশরুম মেমোরি বুস্টার হিসাবে অতুলনীয়।

ঘ) ব্রাহ্মীশাক, পালং শাক – নার্ভ ও ব্রেণ টনিক হিসাবে ব্রাহ্মী বর্তমানে বহুল সমাদর পাচ্ছে। মুসুর ডালের সঙ্গে ব্রাহ্মীশাক সিদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের খাওয়ালে ধীশক্তি বাড়ে। ব্রাহ্মীশাক মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু বায়োজেনিক অ্যামাইন-এর নিঃসরণ বাড়িয়ে দিয়ে বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মেণ্টাল স্ট্রেস কমায় আর অ্যালজাইমারস্ ডিজিজ, ডিমেনশিয়া ও অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপার-কাইনেটিক ডিসঅর্ডার প্রতিরোধে প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া, পালংশাকে থাকে পটাসিয়াম, ভিটামিন-সি,

ভিটামিন-ই, ফলিক অ্যাসিড, আয়রণ ও সমৃদ্ধ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট – যারা আমাদের ব্রেণ-সেলগুলোকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের কবল থেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করে ও মস্তিষ্কে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়।

ঙ) ব্ল্যাকবেরি, ব্লু-বেরি, কালো জাম– ব্লু-বেরির মধ্যে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি লস্-এর ক্ষেত্রে দারুণ কাজ দেয়। পলিফেনল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ব্ল্যাকবেরি ব্রেণসেল-এর প্রদাহজনিত সমস্যার প্রতিরোধে কার্যকরী। এতে নানান ভিটামিন ও মিনারেল আর ফাইবার থাকে – এজন্যে ব্ল্যাকবেরিকে তাবৎ বিশ্ব মেমোরি ফুড হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের দেশে সহজলভ্য কালো জামে থাকা লিউটিন জাতীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেমোরি লস-এর বিরুদ্ধে দারুণ কার্যকরী।

চ) লেটুস শাক, সর্ষে শাক, নটে শাক, কুলেখাড়া শাক, মুলো শাক – বিভিন্ন ভিটামিন, ফলিক অ্যাসিড, আয়রণ ও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে বলে এসব শাক মস্তিষ্কের কোষকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

ছ) তরমুজ, আম, পাকা পেঁপে – তরমুজে থাকা লাইকোপিন নামক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টটি ব্রেনসেল ড্যামেজ প্রতিহত করে ও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রখরতর করে। ক্যারোটিনয়েডস থাকে বলে আম ব্রেণ-এর ওয়ার্ক পাওয়ার বৃদ্ধি করে, ধীশক্তি ও মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। পাকা পেঁপের মধ্যেকার ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি ও ক্যারোটিনয়েডস্ আমাদের ব্রেণ-সেলবে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস্-এর ধ্বংসাত্মক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

জ) কমলালেবু, আঙুর, টম্যাটো — আঙুরের থাকে রেসভেরাট্রল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা মেধাশক্তি ও স্মৃতির প্রখরতা বাড়াতে খুবই উপকারী। উল্লেখ্য, সবুজ আঙুরের থেকে কালো আঙুর বেশী উপকারী। টম্যাটো থেকে প্রাপ্ত অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট লাইকোপিন ফ্রি-র‍্যাডিক্যালদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে রক্ষা করে। ক্যারোটিনয়েডস্, ভিটামিন-সি ও ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ মরশুমি ফল কমলালেব ব্রেণ-পাওয়ার ও মেমোরি বুস্টার হিসাবে অতুলনীয়।

ঝ) বাদাম, ডিম, গাজর – বাদামে থাকে ভিটামিন-ই, ভিটামিন-বি$_৬$, ওমেগা-থ্রি-ফ্যাটি অ্যাসিড আর নানান ধরণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা মস্তিষ্কে রক্ত সংবহনে ও অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা করে। বাদাম হায়ার কগনিটিভ ফাংশান-কে গতি এনে দেয়। নিয়মিত বাদাম খাওয়ার অভ্যাস ভবিষ্যতে অ্যালজাইমারস্ বা ডিমেনশিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞানীমহলে বাদাম গোত্রের অন্যান্য ফল যেমন, আখরোট, আমণ্ড, পিনাট, হ্যাজেলনাট ইত্যাদি মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্ধক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ডিমের কুসুমে কোলিন, যা অ্যাসিটাইল কোলিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারটি তৈরী করতে সাহায্য করে। এছাড়া, ডিমে থাকে টাইরোসিন জাতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড। ডিমের এইসব উপাদান বুদ্ধি বাড়াতে কাজে লাগে, আর বাড়ায় মেণ্টাল অ্যালার্টনেস, কগনিটিভ ফাংশান ও লার্নিং এবিলিটি। মনে রাখবেন, যে সকল শিক্ষার্থী সপ্তাহে ৩-৪টি ডিম খায়, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের হারও অন্যদের তুলনায় তাদের অনেক বেশী। অথচ শুধুমাত্র শরীর গরম হয়ে যাবে এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অনেক মা-বাবারা পরীক্ষার আগে সন্তানদের ডিম খেতে দেন না। গাজরে থাকা ক্যারোটিনয়েডস্ ও লিউটিওথিন মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখে ও ব্রেনসেলদের ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস্ ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া, গাজর ডিমেনশিয়া বা অ্যালাইজাইমারস্-এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়। আমাদের মস্তিষ্কে বিটা অ্যামাইলয়েড প্লাক ফর্মেশন হলে আমরা অ্যালজাইমারস্-এ আক্রান্ত হই। নিয়মিত গাজর খেলে এই প্লাক ফর্মেশান বাধা পায় ও স্মৃতিহ্রাস সংক্রান্ত রোগটি কার্যকরীভাবে প্রতিহত হয়।

ঞ) তৈলাক্ত সামুদ্রিক মাছ - টুনা, হেরিং, স্যামন, ম্যাকরেল, ইলিশ ইত্যাদি মাছে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ইকোসা পেণ্টায়োনিক অ্যাসিড (EPA) ও ডেকোসা হেক্সাওনিক অ্যাসিড (DHA) নামক দুটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উৎপাদনের দ্বারা ব্রেণসেল-এর গতিশীলতা রক্ষা করে, স্মৃতি ও মেধাশক্তির বিকাশ ঘটায়। উল্লেখ্য, সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন ৭৫ গ্রাম মাত্রায় এ ধরণের সামুদ্রিক নোনা মাছ খেতে পারলে অ্যালজাইমার্স-এ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়। নিরামিষ ভোজীরা ওমেগা-থ্রি-ফ্যাটি অ্যাসিড-এর জন্যে সী-ফিশের বিকল্প হিসাবে সয়াবিন অয়েল, ফ্ল্যাক্সসিড অয়েল, আখরোট বা কুমড়ো বীজ খেতে পারেন।

১০. অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাবার

(ক) আপেল — আপেলে কোয়ারসাটিন নামে একটি উপাদান থাকে যা স্মৃতিভ্রংশতা প্রতিরোধ করতে উপকারী।

(খ) ব্রাহ্মী, হলুদ — ব্রাহ্মী শাক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে খুবই উপকারী। হলুদে ঔষধি গুণসম্পন্ন যে কিউরকামেন থাকে, তা এমন একটি অ্যান্টি-অকসিডেণ্ট যা স্মৃতিহ্রাস রোধে অব্যার্থ।

(গ) ডার্ক গ্রিণ ভেজিটেবল — লেটুস ইত্যাদি শাকে প্রচুর পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড থাকে যা স্মৃতিহ্রাস প্রতিরোধকারী।

(ঘ) মাছ — টুনা, হেরিং, বানমাছ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ ফসফাটিডিলসারিন থাকে এবং এই ফসফোলিপিডটি নতুন মেমরি সেল উৎপাদনে সহায়তা করে।

(ঙ) চা, মধু — চা-এ থাকে ক্যাফিন আর পলিফেনল জাতীয় অ্যান্টি-অকসিডেন্ট যারা মেমরি এবং আদার হায়ার কগনিটিভ ফাংশনগুলোকে উজ্জীবিত করে। আর মধু সহজলভ্য একটি স্মৃতিবৃদ্ধিকারক।

(চ) লাল বিট, কমলালেবু — লাল বীট আর কমলালেবুতে অধিকমাত্রায় ফলিক অ্যাসিড ও অ্যানথোসায়ানিন থাকে, যারা শেখা জিনিসকে দীর্ঘদিন মনে রাখতে সাহায্য করে।

(ছ) মিষ্টি আলু, সূর্যমুখীর বীজ — মিষ্টি আলুতে খুবই সমৃদ্ধ ভিটামিন-বি$_{৬}$ থাকে, যা ব্রেনের নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করে এবং মেমরি সেলগুলোর মধ্যেকার অন্তবর্তী যোগাযোগ রক্ষা করে স্মৃতিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে সূর্য্যমুখীর বীজ থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন-ই যে অ্যান্টি-অকসিডেন্ট জোগান দেয়, তা স্মৃতিহ্রাস প্রতিরোধ করতে সুফলদায়ক।

Chapter -- 9

আই. কিউ ও ই. কিউ
পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে

১. ইমোশন্যাল ইন্টালিজেন্স (EQ) **—** যাদের আবেগগত বুদ্ধি (E.Q.) প্রখর থাকে, তারা আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-সচেতন হয় আর তাদের কঠিন আবেগগত অভিজ্ঞতা (difficult emotional experience) সঠিকভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ও পারদর্শীতা থাকে। তারা নিজেদের পজেটিভ ও নেগেটিভ ইমোশনকে সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং নানারকম অচারণগত পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আবেগজনিত পরিস্থিতিকে গঠন-মূলক কর্মযজ্ঞের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে না পারে, তবে তাদের আই কিউ-কেও তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে না। এখন নিম্নলিখিত নীতিগুলির সাহায্যে ই কিউ বাড়ানোর জন্যে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করো ঃ

(ক) ছাত্রজীবনে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আবেগ-মোহ-আকর্ষণ লেখাপড়ায় প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। হৃদয়ের ঐসব অপরিণত আবেগকে ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি দিয়ে সংযত করে পড়াশোনায় মনোযোগ দিলে তোমাদের পরবর্তী জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সাফল্য পাবার জন্যে যে সাধনা করা উচিত, তার বাইরে অন্য চিন্তা মাথায় আনা উচিত নয়।

(খ) নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তোমরা যেন তোমাদের অনুভূতিকে (Feeling) ভোঁতা করে দিও না। কেননা, আবেগের কাঁধে ভর করেই আমরা আমাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নেই। নিজেদের আবেগকে ছাত্র-ছাত্রীদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে তারা সাফল্যের ধারাবাহিকতাকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

(গ) উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমাদের নার্ভগুলোকে অবশ করে। দুশ্চিন্তার কালো মেঘে যদি তোমার মনের আকাশ ছেয়ে থাকে, তাহলে পড়ায় তোমার মন বসবে কি করে? 'আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না' — এই ধরণের নেতিবাচক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যারা বছরের শুরু থেকে আদা-জল খেয়ে পড়াশোনায় লেগে পড়ে, পরীক্ষার আগে তাদের আর উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয় না।

(ঘ) ভয়কে ভয় পেলে সে তোমাকে আরো চেপে ধরবে। বরং তুমি ভয়কে সাফল্যের প্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করো। অংকটা কঠিন, ইংরেজীটা খুব শক্ত বলে যেসব শিক্ষার্থীরা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে তাদের উচিত বিষয় দুটোকে একটু বেশি সময় দিয়ে যত্ন করে পড়া। মাঝ-সমুদ্রে ঝড়ে ডুবে যাবার ভয়ে জাহাজ বানিয়ে কেউ কি সেটা সবসময় বন্দরে নোঙর করে বসিয়ে রাখে?

(ঙ) উদ্যম আর সাফল্য পরস্পরের যমজ ভাই। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি তাদের লক্ষ্য স্থির করে, আর প্রবল উদ্যমে পাঠে ব্রতী হয়, তাদের সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না। তোমরা সবাই সাফল্যকে পাখির চোখ করে এগিয়ে যাও, কাঙ্খিত সফলতা তোমার কাছে ধরা দেবেই।

২. ইনটেলিজেনস্ কোসেণ্ট (IQ) **—** বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন এক মানসিক ক্ষমতা যার সাহায্যে তারা তথ্যকে আত্মস্থ করে সেগুলোকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করতে পারে। শিক্ষার্থীর প্রকৃত বয়সের সাথে তার মানসিক বয়সের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার জন্যে বুদ্ধির ভাগফল বা বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ)-এর উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(ক) বুদ্ধির পরিমাপ — প্রকৃত বয়স (Chronological Age) এবং মানসিক বয়স (Mental Age) এই দুটির আনুপাতিক সম্বন্ধই হল বুদ্ধ্যঙ্ক। শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ওই ছাত্র বা ছাত্রীর বুদ্ধির পরিমাপ বা বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) বলে। ধরা যাক, একটি ছেলে বা মেয়ের প্রকৃত বয়স (Chronological Age-CA) ১২ বছর, কিন্তু সে, মনে করুণ, ৯ বছরের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল — তাহলে তার মানসিক বয়স (Mental Age-MA) হচ্ছে ৯ বছর। এক্ষেত্রে, তার বুদ্ধাঙ্ক (IQ) হবে ...

$$\frac{৯}{১২} \times ১০০ = ৭৫$$

অথবা ধরা যাক, একটি মেয়ের প্রকৃত বয়স (CA) ৮ বছর কিন্তু যদি সে ১০ বছর বয়সের উপযোগী প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে সমর্থ হয় তখন তার মানসিক বয়স (MA) হবে ১০ বছর। এক্ষেত্রে অঙ্কের হিসাবে তার বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) হবে ...

$$\frac{১০}{৮} \times ১০০ = ১২৫$$

(খ) শ্রেণী বিভাজন – যাদের আই-কিউ ১০০-এর আশেপাশে, তাদের সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন বলে ধরা হয়। যাদের আই-কিউ ১০০-এর বেশি তাদেরকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলা হয়, আর যাদের আই-কিউ ১০০-এর কম তাদের অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান বলে ধরা হয়। এরকমভাবে ক্রমশ: নীচের দিকে যেতে যেতে জড়ধী (Idiot) আর উপরের দিকে অসাধারণ প্রতিভাবানদের (Extraordinary Genius) পাওয়া যায়।

১. জড়ধী (Idiot) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ১০ থেকে ২৫-এর মধ্যে। খুব চেষ্টা করে কেবল সহজ কতকগুলি কাজ এদের শেখাতে পারা যায়।

২. মন্দধী (Imbecile) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ২৬ থেকে ৫০-এর মধ্যে। এদের প্রকাশ করার ক্ষমতা খুব অল্প। খুব চেষ্টা করে অভ্যেস করিয়ে দিলে এরা কোনো কাজ গতানুগতিকভাবে করতে পারে।

৩. ক্ষীণধী (Moron) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ৫১ থেকে ৭০-এর মধ্যে। এরা কোনোকরমে দৈন্দদিন জীবন চালিয়ে নেবার মত বুদ্ধি-সম্পন্ন। মোটামুটি কোনো রকমের কাজ শিখে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। এরা খুব চেষ্টা করে অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে পারে।

৪. অল্পধী (Feeble-minded Dull) — বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ৭১ থেকে ৯০-এর মধ্যে। এরা কোনো নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গ তিবিধান করে চলতে পারে না। লেখাপড়ায় এরা কিছুদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

৫. সাধারণ বুদ্ধি (Average) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯১ থেকে ১১০-র মধ্যে। এদের খুব চেষ্টা করে তবে লেখাপড়ায় কাঙ্খিত সাফল্য পেতে হয়।

৬. উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন (Bright) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ১১১ থেকে ১২০-এর মধ্যে। এদের লেখাপড়ায় সফলতার হার বেশ ভালো।

৭. বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন (Very Bright) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ১২১ থেকে ১৪০-এর মধ্যে। এরা উচ্চশিক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য পায়।

৮. প্রতিভাবান (Genius) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ১৪১ থেকে ১৬০-এর মধ্যে। এরা দার্শনিক বিজ্ঞানী, ইত্যাদি হয়ে থাকেন।

৯. অসাধারণ প্রতিভাবান (Extraordinary Genius) — এদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) ১৬০-এর উর্দ্ধে। এদের বুদ্ধির ক্রিয়ায় মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। মানব-সভ্যতার বড় বড় আবিষ্কার এদের দ্বারাই সম্ভব।

(গ) টেস্ট ইন সাইকোলজি ফর ইনটেলিজেন্স এণ্ড মেমরি

১. ইনটেলিজেন্স টেস্ট (Intelligence Tests) –

(ক) ভার্বাল কমপ্রিহেনশন টেস্ট
(খ) ওয়ার্ড এণ্ড নাম্বার ফ্লুয়েন্সি টেস্ট
(গ) মেমরি রিটেনশন এণ্ড রিপ্রোডাকশন টেস্ট
(ঘ) পারসেপচ্যুয়াল এবিলিটি টেস্ট
(ঙ) ভিস্যুয়ালাইজড স্পেস এবিলিটি টেস্ট
(চ) টেস্ট অফ রিসনিং
(ছ) বিনে-সিমন ইণ্টেলিজেন্স টেস্ট
(জ) স্ট্যানফোর্ড-বিনে ইণ্টেলিজেন্স টেস্ট
(ঝ) ওয়েসলার-বেলভিউ টেস্ট
(ঞ) নক'স্ কিউব কনস্ট্রাকশন টেস্ট
(ট) ডিয়ারবর্ন'স ফর্ম বোর্ড টেস্ট
(ঠ) ভাইনল্যাণ্ড ম্যাচুরিটি স্কেল

২. অ্যাপটিচিউড টেস্ট (Aptitude Test) —

(ক) স্কলাসটিক অ্যাপটিচিউড টেস্ট

(খ) ভোকেশনাল অ্যাপটিচিউড টেস্ট

(গ) ডেট্রয়েট ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপটিচিউড টেস্ট

৩. পার্সোন্যালিটি অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট (Personality Assessment Tests) —

(ক) মিনেসোটা মাল্টিফেসিক পার্সোন্যালিটি ইনভেন্টরি (এমএমপিআই)

(খ) টেস্ট থ্রু রর্চ ইঙ্কব্লট টেকনিক

(গ) থিম্যাটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট (টি এ টি)

(ঘ) ওয়াইটেনবর্ন পার্সোন্যালিটি রেটিং স্কেল

৪. পারফর্ম্যান্স টেস্ট (Performance Tests) —

(ক) নন-ভার্বাল পাস অ্যালং টেস্ট

(খ) নন-ভার্বাল মেজ একসপ্লোরেশন টেস্ট

(গ) আর্মি-বিটা প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট

যথাসময়ে আপনার সন্তানের সাইকোমেট্রি (আই.কিউ) টেস্ট করিয়ে নিয়ে, তার মেরিট অনুযায়ী সে ভবিষ্যতে আর্টস, কর্মাস, না সায়েন্স পড়বে তা ঠিক করবেন।

Chapter -- 10

ব্রেণ-পাওয়ার বাড়ানোর মানসিক ব্যায়াম

১. যখনই কোনো নতুন চিন্তা মাথায় আসবে, তৎক্ষণাৎ কোথাও তা লিখে রাখবে। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ কোনো ভাবনা মনে উদয় হলে তা লিখে রাখার জন্যে সঙ্গে সবসময় নোটবুক ও পেন রাখা দরকার।

২. নেশাসেবন ও মদ্যপানে আসক্তি কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়। এ সবে মনঃসংযোগ ব্যহত হয় ও স্মৃতিশক্তির ক্ষতি হয়।

৩. নানান ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত খেলাধূলা বা বুদ্ধিমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে মনের ব্যায়াম হয়। শব্দছক, দাবা, অন্ত্যাক্ষরী ইত্যাদি অবসর সময়ে চর্চা করলে মস্তিষ্কচালনা তীব্র হয়।

৪. কোনো বিষয়ে আপন মনে কথা বলা অভ্যাস করুন, দেখবেন স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক জিনিস রি-কল করতে পারছেন। নিজের সাথে নিজের কথোপকথন দারুণভাবে স্মৃতির প্রসার ঘটায়।

৫. নিজেকে মোটিভেটেড রাখার জন্য অবসর সময়ে ভালো বই আর সেল্ফ-হেল্প বিষয়ক সিডি / ডিভিডি শুনুন।

৬. নিজেকে সর্বদা নিরাশাবাদী লোকজনদের থেকে সরিয়ে রাখবেন। সর্বদা আশাব্যঞ্জক মানসিকতা নিয়ে মানুষের সাথে মিশুন। দেখবেন, আপনার ব্রেন-এর ক্ষমতা ব্যবহারের পরিধি বেড়েছে।

৭. আপনি নিয়মিত ডায়েরী লেখা অভ্যাস করুন, আপনার ইমাজিনেটিভ পাওয়ার বাড়বে আর আপনি হয়ে উঠবেন অসাধারণ ব্রেন পাওয়ারের অধিকারী।

৮. অনেক লোক, দেখবেন, কথায় কথায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন। এটা কালক্রমে স্মৃতিশক্তির জড়তা ডেকে আনতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের বলছি, নিজের সামর্থ্যমত গুণ-বিয়োগ, যোগ-ভাগ খাতায়-কলমে বা মনে মনে সমাধান করার চেষ্টা করবে।

৯. অত্যাধিক মানসিক অবসাদ ব্রেন-পাওয়ার নষ্ট করে দিতে পারে। টেনশান কাটিয়ে ওঠার জন্যে তার কারণ অনুসন্ধান করে সেল্ফ কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে আপনাকে নিজেকে এর সমাধান করতে হবে।

(ক) নিজের সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী না হলে তোমার লেখাপড়ায় আগ্রহ বাড়বে না। পরীক্ষায় সফলকাম হবার জন্য যে যে শর্ত পালন জরুরী সেগুলো চর্চার জন্যে নিষ্ঠাবান হতে হবে। মনে রাখবে, হারার জন্যে কেউ খেলতে নামে না।

(খ) কোনো পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য না পেলে হতাশাগ্রস্থ হলে চলবে না। বরঞ্চ ব্যার্থতার সঠিক কারণ খুঁজে তার সমাধান করে আগামী সাফল্যের জন্যে একনিষ্ঠ উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইই থাকবে। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি যেন তোমাকে গ্রাস না করে। সেজন্যে তুমি যখন উদ্বেগ বা অবসাদগ্রস্থ অবস্থায় থাকো, তখন কিছুটা সময় তোমার প্রিয় শিল্পীর গান বা লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার অভ্যাস রাখতে পারো।

(ঘ) অবসাদ বা বিষন্নতা যাতে তোমার মেমরি পাওয়ারের উপর আচ্ছন্ন না হতে পারে, তার জন্যে প্রিয় বন্ধু বা পরিবারের বন্ধু-স্থানীয় কারুর সাথে তোমার যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারো।

(ঙ) নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন লোকজনের সান্নিধ্যে থাকবে না। তারা তোমার লেখাপড়ায় মনোযোগ ও আগ্রহকে নিরুৎসাহিত করবে।

(চ) মেমরি আর ব্রেন ফাংশান বাড়াতে যোগাসন, প্রাণায়াম এবং খেলাধূলার বিকল্প নেই। এগুলোর চর্চার মাধ্যমে যে মেন্টাল রিফ্রেসমেন্ট তুমি পাবে, তা তোমার পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করবে।

(ছ) মননচর্চায় সহায়ক ধর্মপুস্তক ও মহাপুরুষের জীবনী পড়ো কারণ এর মাধ্যমে লব্ধ অনুপ্রেরণা তোমার আগামী শিক্ষাজীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

(জ) মনের ভারসাম্য না থাকলে স্মৃতি তোমাকে প্রতারণা করবে। মানসিক সাম্যের জন্যে তাই ধ্যান অভ্যাস খুবই কার্যকরী।

(ঝ) দিনের পড়া দিনের দিন শেষ করে রাখবে। আগামীকাল করবো বলে কোনো কাজ ফেলে রাখবে না। অযথা ফেলে রাখা পড়ার চাপ মেমরির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১০. কবিতা, মজাদার হাসির গল্প ইত্যাদি পড়ে বা অন্যদের থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করার চেষ্টা করুন। পরে কখনো নতুন কাউকে তা শোনান। এভাবে স্মৃতির প্রসর বিস্তৃত হবে।

১১. অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধব চেনাজানা পরিচিত মানুষজনের নাম রি-কল করার চেষ্টা করুন। এবার তাদের নামের সাথে সাদৃশ্য রেখে তাদের মুখমণ্ডলগুলি স্মরণ করুন। এভাবে নামের সাথে চিত্রকল্পের রিকলিং ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধির সহায়ক।

১২. ভুল হয়ে যাবার ভয় পেয়ে নতুন কিছু করার থেকে বিরত হবেন না। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। নতুন কিছু করার জন্যে কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করলে আপনার চিন্তা করার শক্তি বাড়বে।

১৩. টেনশানকে দূরে রাখতে চেষ্টা করুন। কারণ ছোটখাটো টেনশানও স্মৃতি-নাশক। জীবনে সব ধরণের উত্থান-পতনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখুন।

১৪. আজ সারাদিন আপনি কি কি করবেন তার একটা তালিকা সকালেই তৈরি করে নিন। অনুরূপভাবে আপনার প্রত্যেক সপ্তাহের এবং সারা বছরের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে রাখুন। কোন্ কোন্ কাজে আপনি কতটা সফল হচ্ছেন, কিছুদিন অন্তর তার মূল্যায়ন করে নেবেন। আর আপনার নিজের কাজ সবসময় আপনি নিজে করার চেষ্টা করবেন। যে কোনো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সক্রিয়তা তাঁর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

১৫. ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে নতুন ভাষা শিক্ষার কোনো জুড়ি নেই। বিদেশী ভাষা শেখার অনাবিল আনন্দ ব্রেনের সক্রিয়তাকে গতিশীল রাখে।

Chapter -- 11

মনঃসংযোগ বাড়ানোর পদ্ধতি

মা-বাবারা অনেকেই আমাকে এসে বলেন, আমার ছেলে ক্লাশ ফোর-ফাইভ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করত, বেশী ভালো রেজাল্ট করত কিন্তু এইট-নাইনে উঠে তার এডুকেশানাল পার্ফরমেন্স ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বা আমার মেয়ে আগে একটানা অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা করত, এখন পড়াশুনাতে তার একদম মন নেই। এসব ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে বুদ্ধি তো আর কমে যায় না– ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট খারাপের জন্যে কারণ হিসাবে দেখা দেয় মনঃসংযোগের অভাব বা মনোযোগের অক্ষমতা। ছোটদের অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপার-কাইনেটিক ডিসঅর্ডারস-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিশেষ একটি কাজের ব্যাপারে মনঃসংযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা দেখা যায়। নিম্ন-বুনিয়াদি ক্লাশে বিষয়-সংখ্যা কম ও অল্প পড়তে হোত বলে, চঞ্চলতা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবিষয় পড়ে নিতে পারতো। কিন্তু উঁচু ক্লাশে বেশী সংখ্যক বিষয় পড়তে হয় বলে অতি-চঞ্চলতার সমস্যা এডুকেশনাল পার্ফরমেন্সের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফ্যালে।

বুদ্ধি মেধা বা স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মনঃসংযোগের ঘাটতির জন্যে শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট ভালো না হলে, তা ছাত্র বা তার মা-বাবার জন্যে উদ্বেগজনক। মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্যে তাই নিচের এইসব পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে হাতে-নাতে ফল মিলবে –

১. স্পেসড্ রিডিং – কোনো একটা সাবজেক্ট পড়া শেষ হলেই অন্য নতুন একটা বিষয় নিয়ে পড়তে বসে যাওয়া ঠিক নয়। প্রথম পাঠ্যবিষয়টিকে ব্রেণ-এর লং-টার্ম মেমোরিতে পৌঁছাতে পনেরো মিনিট সময় দিয়ে তারপরে অন্য নতুন বিষয়ে মনোনিবেশ উচিৎ।

২. লাউড-রিডিং – জোরে জোরে উচ্চারণ করে পাঠ্যবিষয় পড়তে পারলে মনঃসংযোগ অক্ষুন্ন থাকে। পাঠক্রিয়ার মাঝে অন্য আজে-বাজে ভাবনা ঢুকে গিয়ে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিয়ে পড়াশুনাকে বিঘ্নিত করে না।

৩. নাম্বার অফ কনসেনট্রেটিং সাবজেক্টস্– একজন ছাত্রের বা ছাত্রীর মনোযোগের পরিসর (স্প্যান অফ অ্যাটেনশন) তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বাইরে যেতে পারে না। সেজন্যে মনঃসংযোগ করতে হবে এমন পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যা অনেক বেশী হলে, শিক্ষার্থীরা সার্বিকভাবে সব বিষয়ের উপর যথাযথ নজর দিতে পারবে না।

৪. ক্ল্যাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক থেরাপি – মনঃসংযোগ ও স্মৃতি-প্রসর বাড়াতে যন্ত্র-সঙ্গীত ট্রেনিং-এর কার্যকরী ভূমিকা আছে। লেখাপড়ায় একাগ্রতা বাড়াতে মিউজিক ট্রেনিং খুবই কাজে আসে। পছন্দের লঘুসংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীত যেহেতু স্ট্রেস ও টেনশান কমাতে ফলদায়ক – মিউজিক থেরাপি শিক্ষার্থীর স্ট্রেস ম্যানেজমেণ্ট-এ সাহায্য করতে পারে।

৫. হোল-লার্নিং এণ্ড পার্ট-লার্নিং টেকনিক – যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাটেনশান ডিফিসিট ডিসঅর্ডার আছে, তারা পাঠ্যবিষয়ে পুরোটা একসঙ্গে না পড়ে অল্প অল্প করে ভাগ করে নিয়ে পড়বে। প্রথম ৫-৬ টি লাইন একটানা পড়ে, বই না দেখে তারপর সেটাকে মনে মনে রিকল করে নেবে। এইভাবে ৫-৬ টা লাইন পড়বে। এভাবে পড়লে কম কম পরিমাণ তথ্য জানে রূপান্তরিত হয়ে লং-টার্ম মেমরিতে গিয়ে সঠিক জায়গা করে নেবে।

৬. সিলেকশন অব সাবজেক্ট – পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র না থাকলে তার পাঠক্রিয়া স্মৃতি সহায়ক হয় না। প্রায় সব শিক্ষার্থীর কিছু পছন্দের বিষয় থাকে কিছু অপছন্দের বিষয় থাকে। কঠিন লাগে বা অপছন্দের বিষয় পর পর না পড়ে– মিলিয়ে মিশিয়ে পছন্দের অপছন্দের সাবজেক্ট পড়লে অপছন্দের বিষয়ের প্রতি পাঠ-ভীতি কেটে যায়। পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র-একঘেঁয়েমি কাটাতে সাহায্য করে এবং অপছন্দের বিষয় ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করে। আর ভালো-লাগা বিষয়বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

৭. সাবজেক্ট অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেণ্ট – অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী ও গণিত-ভীতি সুবিদিত। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খারাপ পারফরমেন্স সার্বিকভাবে খারাপ রেজাল্টের জন্যে দায়ী হয়। বিশেষজ্ঞ সাইকোলজিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে স্ট্রেস অ্যাণ্ড অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেণ্ট করে বিষয-ভীতি কাটাতে হবে।

৮. **রিডিং বিওণ্ড** – স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আগ্রহ আছে এমন নানা বিষয়ের তথ্য-সমৃদ্ধ বই পড়ার অভ্যাস রাখতে হবে। পাঠ্যবিষয় বৈচিত্রের কারণে স্কুল-পাঠ্যে মনোনিবেশ বৃদ্ধি পাবে।

৯. **লার্নিং ডিসএবিলিটি ম্যানেজমেণ্ট** – যে সমস্ত শিক্ষার্থীর শিখন-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত থাকে, তাদের পাঠে মনোযোগের অসুবিধা হয়। কারুর দেখা যায় ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল দুর্বল, কারুর বা ম্যাথাম্যাটিক্যাল স্কিল দুর্বল কিংবা কারুর অ্যামনেশিয়া, ডিসলেক্সিয়া বা অ্যাফেসিয়া ইত্যাদির সমস্যা আছে। তাদের জন্যে স্পেশ্যাল এডুকেটরের মাধ্যমে কারেকশনাল ট্রেনিং দিতে হবে।

১০. **প্রসেস অফ টিচিং** – শেখানোর ও পড়ানোর পদ্ধতি যতটা সম্ভব সহজ, সরল ও মনোগ্রাহী হতে হবে। শিক্ষক মহাশয়কে নজর দিতে হবে, পড়া বুঝতে ও শুনতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো লাগছে কিনা। যতক্ষণ তাদের ভালো লাগবে ততক্ষণই পড়ানো উচিত, জোর করে পড়ালে তাদের মাথায় কিছু ঢুকবে না। মনোযোগ দিয়ে তারা পড়া শুনবেও না।

১১. **ব্যাক কাউণ্টিং প্র্যাকটিস** – ১০০ থেকে বিপরীত ক্রমে ১ পর্যন্ত কোনো সংখ্যা বাদ না দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে গণনা অভ্যাস করলে মনোযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে ফল মেলে।

১২. **সিনারি অ্যারেনজিং এ্যাণ্ড লেটার ক্যানসেলেশান** – নিচু ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের সিনারি সাজানো বা নানান রঙ-এর জিনিস মিশিয়ে দিয়ে রঙ-ভিত্তিক আলাদা করতে অভ্যাস করান। অথবা, একপাতার একটি পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ একটি বর্ণ চিহ্নিত করে তা কাটতে কাটতে যেতে বলুন। এসব অভ্যাস ছোটদের মনঃসংযোগ বাড়ায়।

১৩. **সিরিয়াল সাবট্র্যাকশন মেথোড** – ৫০ থেকে ৪, তারপরে ৭ বিয়োগ করতে করতে নীচে নামা। অথবা, ২০০ থেকে ৬, তারপরে ৯ বিয়োগ করতে নীচের দিকে নেমে আসা। এতে মনের একাগ্রতা বাড়ে।

১৪. **ব্রেণ-গেম** – ক্রসওয়ার্ড পাজল, মেমরি গেম, মেণ্টাল ম্যাথামেটিকস্ বা শব্দছক অনুশীলনে মনোযোগের বিকাশ হয়। এছাড়াও, এতে মস্তিষ্কের হায়ার কগনিটিভ ফাংশনের নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি সজীব ও কর্মক্ষম হয়।

১৫. ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত রাত জেগে পড়া, মাত্রাতিরিক্ত টিভি দেখা, মোবাইলে সর্বক্ষণ গেম খেলা বা নেট সার্ফ করা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারে বসে কাজ করা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এসবে মনোযোগের ঘাটতি প্রকট হয়।

Chapter -- 12

কিভাবে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া যায়

১. ভালো শ্রোতা না হতে পারলে আপনি কখনোই সুবক্তা হতে পারবেন না। সবকিছু মন দিয়ে শোনার অভ্যাস মস্তিষ্কের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। ক্লাশে পড়ার সময় শিক্ষক মহাশয় যা বোঝাচ্ছেন তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলে তা স্মৃতি-সহায়ক হয়।

২. কল্পনায় আপনার জীবনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষটির মুখ, চোখ বন্ধ করে ধ্যানভঙ্গীতে বসে দেখার চেষ্টা করুন। সেই প্রিয় মানুষটির মুখের গঠন বা তাঁর চুলের স্টাইল মনঃশ্চক্ষে দেখার চেষ্টা করুন।

৩. অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আমাদের শর্টটার্ম মেমরি হ্রাস পায়। কফি ইত্যাদি পানীয় যাতে ক্যাফেইন আছে তা বর্জন করুন। ক্যাফেইন উত্তেজক পদার্থ যা ব্রেন সেলগুলোকে অকেজো করে দিতে পারে। আর ধূমপান নৈব নৈব চ। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে মস্তিষ্কে অকসিজেন যোগান হ্রাস পায় এবং নানারকম স্মৃতির বিকার দেখা দেয়।

৪. হাতের কাজে সহজলভ্য কোনো একটি জিনিস নিয়ে সেই বস্তুটির সম্পর্কে নানা আঙ্গিকে পর্যালোচনা করতে থাকুন। যেমন, আপনার মোবাইলটি নিয়ে ভাবুন ওটা কি কি জিনিস দিয়ে তৈরি, ওর সার্কিটটা কেমনভাবে তৈরি, ওটার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কি আছে, ইত্যাদি। কোনো বিষয়ের গভীরে ঢোকার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে কোনো বস্তুর খুঁটিনাটি সম্পর্কে মাথা ঘামালে আপনার স্মৃতি-প্রসর বিস্তৃত হবে।

৫. পরিমাণমত জল না খেলে শরীরে জলের ঘাটতি হয়। তখন ব্রেন সেলগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এর ফলে ব্রেনের কর্মক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যাঁরা অনিদ্রার শিকার তাঁরা শারীরিকভাবে বেশি ক্লান্তি অনুভব করেন। তার ফলে তাঁদের কনসেনট্রেশন পাওয়ার এবং রিটেনিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্রেণ বহুলাংশে কমে যায়। মস্তিষ্ককে ঘুমের মাধ্যমে বিশ্রাম দিলে নতুন শেখা তথ্যগুলো, সে স্মৃতির আকারে থরে থরে মেমরি স্প্যান-এ সাজিয়ে রাখার সময় পায়।

৬. জীবনের একঘেয়েমি আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাতে কালক্রমে স্মৃতিহ্রাস হয়। সেজন্যে নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে পারলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

৭. অনেক তথ্যের সমাহারে একটি ঘটনা রূপ পায়। তথ্যের সংকেতের মাধ্যমে যখন আমরা ঘটনার রূপ দেবার চেষ্টা করি, তখন তা অনায়াস-সাধ্য হয় না। সেজন্যে আপনার জানা ঘটনাগুলোকে ছবির রূপে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। দেখবেন সেটা আপনার সামনে প্রাণবন্ত হয়ে ভেসে উঠবে, যা অনেকদিন আপনার স্মৃতির ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকবে।

৮. কম্পিউটারের কি-বোর্ডে দু'পাতা কিছু একটা টাইপ করুন। কর্মস্থল থেকে ফিরে বাড়ির কারুর সাথে দাবা খেলতে বসুন। আপনার সৃজনধর্মী চিন্তা করার ক্ষমতা এতে যারপরনাই বৃদ্ধি পাবে।

৯. প্রত্যেকটি শেখা ঘটনা মাঝে মধ্যে মনে করার চেষ্টা করুন এবং তা নিজের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে বলার অভ্যাস রাখুন। কোনো ঘটনা কাউকে বলার সময় অপ্রয়োজনীয় বলে কোনো অংশ বাদ দেবেন না, বরং বিস্তারিতভাবে সব অংশগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বলার চেষ্টা করবেন। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে পারার অভ্যাস আপনার চিন্তা-প্রক্রিয়াকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করবে।

১০. দানাশষ্য, সবুজ টাটকা শাকসব্জী ও ফলমূলে উপরিউক্ত ভিটামিনগুলো প্রচুর পরিমাণে থাকে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে আপনার সন্তানের ডায়েট চার্ট-এ যেন অবশ্যই ভিটামিন ও ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ শাকসব্জী ও ফলমূল থাকে।

১১. নিজেকে মানসিক চাপের মধ্যে রাখলে কনসেনট্রেশন পাওয়ার ব্যহত হবে। মনকে সর্বদা ফুরফুরে মেজাজে রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করুন। হাল্কা ধরনের যোগ-ব্যায়াম আপনাকে রিল্যাকস্ড করতে সাহায্য করবে।

১২. ঘুমের ঔষধ, মাংশপেশীকে শিথিল করার জন্য ব্যবহৃত ঔষধ, ব্যাথা-বেদনা উপশমকারী ঔষধ, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা কাটানোর ঔষধ বা হাই ব্লাড-প্রেসার কমানোর ঔষধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। এগুলো ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়।

১৩. কবিতা মুখস্ত করার অভ্যাস স্মৃতিশক্তি বর্ধক। কবিতা আত্মস্থ করলে তার অন্তর্নিহিত ঘটনাক্রম আপনার মনে চিত্রকল্প হয়ে গেঁথে থাকবে। এইভাবে ঘটনাপ্রবাহকে চিত্রকল্পে রূপদানের ক্ষমতা বাড়াতে পারলে আপনার মেমরি পাওয়ারও বেড়ে যাবে।

Chapter -- 13

স্মৃতিহ্রাস ঃ কারণ ও প্রতিকার

১। স্মৃতিহ্রাসের বিভিন্ন কারণ

ক) স্নায়ুঘটিত কারণ

১. অ্যালজ্যাইমার রোগ — অ্যালজাইমার রোগে মানুষ খুব বেশি করে বাড়ির নাম্বার, স্থানের নাম বা পরিচিত লোকের নাম ভুলে যায়। এই রোগীরা একই কথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, যথাযথ শব্দবন্ধ মাথায় না আসার ফলে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। রোগী কাজে কর্মে উদ্যম হারিয়ে ফেলে, কোনো কিছুতেই আগ্রহ না থাকার ফলে অসলভাবে শুয়েবসে দিন কাটায়। এছাড়াও অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত রোগীর বুদ্ধি-বিবেচনার সমস্যা, সময়-স্থান-কাল বোধের সমস্যা এবং লেখা ও কোনো কিছু বোঝানোর সমস্যা হয়।

২. পিকস্ ডিজিজ — পিকস্ ডিজিজ-এ ব্যক্তিত্বের বিকার ও স্মৃতিভ্রংশ দেখা যায়।

৩. হেপাটো-লেন্টিকুলার ডিজেনারেশন — ক্রোমোজোম ঘটিত বংশগত এই রোগটি উইলসন'স ডিজিজ নামে পরিচিত। এই রোগে মানসিক জড়বুদ্ধির সমূহ লক্ষণ বর্তমান থাকে।

৪. হানটিংটন'স ডিজিজ — এই রোগে অন্যান্য লক্ষণের সাতে স্মৃতিলোপেরও লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

৫. পারকিনসন্স্ ডিজিজ্ — পারকিনসন্স্ রোগে হাত-পা কাঁপার সাথে সাথে স্মৃতিহ্রাসের লক্ষণও দেখা যায়।

৬. প্রগ্রেসিভ সুপ্রা-নিউক্লিয়ার পালসি — মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্যারালিসিস্-এর জন্যে স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

৭. ইন্ট্রা-ক্রেনিয়াল টিউমার — ব্রেন-এর অভ্যন্তরে টিউমার হলে স্মৃতিহ্রাসের কারণ হতে পারে।

৮. সাবডুরাল হেমাটোমা — মস্তিষ্কের ডুর‍্যা-ম্যাটার অংশে রক্ত জমার ফলে স্মৃতিহ্রাস হতে পারে।

৯. সেরিব্রো ভাসকুলার অ্যাকসিডেন্ট — উপরিউক্ত প্যাথোলজিক্যাল কণ্ডিশানে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় ও পর্যায়ক্রমে স্মরণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে।

১০. নিউরো সিফিলিস ইনফেকশন — মস্তিষ্কে এই ধরণের সিফিলিস্-এ স্মৃতিহ্রাসের লক্ষণ দেখা যায়।

১১. হরমোনের সমস্যা — থাইরয়েড হরমোন ও কর্টিক্স স্টেরয়েড হরমোনের প্রভাবে এইসব রোগে স্মৃতিহ্রাস ও ছাত্র-ছাত্রীদের লার্নিং ডিসঅ্যাবিলিটি-র লক্ষণ বর্তমান থাকে।

১২. মেটাবলিক ইউরেমিয়া — আমাদের দেহের রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে আর গ্লুকোজ-এর মাত্রা কমে গেলে মানসিক বিভ্রান্তি ও স্মৃতিহ্রাসের লক্ষণগুলো প্রকট হয়।

১৩. ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম-ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স — মানবদেহের রক্তরসে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম আর ইলেকট্রোলাইট-এর ভারসাম্য বিপর্যস্ত হলে স্মরণ-ক্রিয়া ব্যহত হয়।

১৪. ভিটামিনের অভাব ঃ ভিটামিন বি$_{১২}$, ফলেট, নিয়াসিন, থায়ামিন — উপরিউক্ত ভিটামিনের অভাবে ব্রেনের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় ও স্মৃতির বিকার দেখা দেয়।

১৫. অতিরিক্ত মদ্যপান — অতিরিক্ত মদ্যপানে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষগুলি অসাড় হতে থাকে। ফলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৬. হেভি মেটাল পয়জনিং — বিভিন্ন ধরণের ভারী ধাতুর বিষক্রিয়ায় মেণ্টাল কনফিউসন ও ডিমেনসিয়া দেখা যায়। সীসা বা পারদ জাতীয় ভারি ধাতুর বিষক্রিয়া থেকে সুতরাং সাবধান।

খ) প্যাথোলজিক্যাল কারণ

১. ব্রেণ শুকিয়ে যাওয়া — মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ শুকিয়ে যাবার ফলে স্মৃতিলোপ হয়।

২. ইমম্যাচিওর মেমরি সার্কিট — স্মৃতির বর্তনীগুলো পরিণতভাবে তৈরি হবার আগের শেখা জিনিসগুলি আমাদের মন থেকে হারিয়ে যায়।

৩. সেরিব্রাল কর্টেকস, হিপ্পোক্যাম্পাস ও অ্যামাইগডালা-র কাজের অসামঞ্জস্য — আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতি-সংক্রান্ত কর্মযজ্ঞে সমন্বয়-সাধন করে অ্যামাইগডালা, হিপ্পোক্যাম্পাস্ আর সেরিব্রাল কর্টেকস এদের সমন্বয়ের অভাব হলে স্মরণ-প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

৪. ইমপেয়ারমেণ্ট অফ মেমরি সার্কিট — স্মৃতির বর্তনীগুলো সঠিকভাবে কাজ না করলে আমরা অনেক জ্ঞাত তথ্য ভুলে যাই।

৫. ইমম্যাচিওর হিপ্পোক্যাম্পাল ফর্মেশন — আমাদের ছোটবেলায় হিপ্পোক্যাম্পাস্ অপরিণত থাকার ফলে তখনকার শেখা শর্টটার্ম-মেমরি কোনোভাবে লং-টার্ম মেমোরি-তে রূপান্তরিত হতে পারে না। ফলে ঐসব স্মৃতি মনের অতলে চিরতরে হারিয়ে যায়।

গ) সাইকোলজিক্যাল কারণ

১. শেখার বিষয়বস্তু গভীরভাবে অনুধাবন না করলে, আমরা তা সহজেই ভুলে যাই।

২. ক্লান্ত অবসন্ন মনে পড়তে বসলে, তখনকার শেখা তথ্য ভুলে যাবার সম্ভাবনা প্রবল।

৩. পূর্বে অর্জিত গভীর কোনো স্মৃতি পরবর্তী সদ্য শেখা জ্ঞানের বিষয়কে ভুলিয়ে দিতে পারে। আবার নতুন শেখা বিষয়ের গভীরতা আগেকার স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে পারে।

৪. আগ্রহ আর যথাযথ মনোযোগের অভাবে অনেক জিনিস আমরা ভুলে যাই।

৫. ভয়, টেনশান বা উদ্বেগজনক পরিবেশে শিখন অচিরে আমরা ভুলে যাই।

৬. পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে না এমন বিষয় আমরা বহুদিন মনে রাখতে পারি না। সুতরাং জীবনে প্রাসঙ্গিকতার অভাবে আমরা অনেককিছু ভুলে যাই।

২। স্মৃতিহ্রাসের ম্যানেজমেণ্ট ও চিকিৎসা

(ক) বিচিত্রধর্মী বিষয়ে চর্চার জন্য আপনার মস্তিষ্ককে ব্যবহার করুন। আগ্রহের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়লে ব্রেনের মেমরি সার্কিট চাঙ্গা থাকে যা ফলত: আপনার স্মৃতিহ্রাসকে আটকাতে সাহায্য করবে।

(খ) যেভাবে হোক প্রত্যহ কিছুটা সময় ব্যায়াম বা অন্য যে কোনো ধরণের খেলাধূলার জন্যে বরাদ্দ রাখুন। শারীরিক কসরতে দেহ সুস্থ-সবল থাকলে মস্তিষ্কচর্চার সময় ক্লান্তি আসে না।

(গ) নিজেকে সর্বদা টেনশান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।

(ঘ) মেডিটেশন বা ধ্যান ও যোগ-ব্যায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের মানসিক ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(ঙ) আপনার কল্পনাশক্তিকে সৃজনশীল চর্চায় নিয়োজিত রাখুন যা স্মৃতিহ্রাস আটকাতে অতুলনীয়।

(চ) বেশি লবণ খাওয়া ভালো নয়। ব্লাড-প্রেশার, কোলেস্টেরল, ট্রাই-গ্লিসারাইড, ইত্যাদি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবেন।

(ছ) টাটকা মরশুমি সবজি-ফল প্রত্যেকদিনের মেনুতে থাকে যেন।

(জ) স্মৃতিহ্রাস আটকাতে অ্যাণ্টি-অকসিডেণ্ট সমৃদ্ধ খাবার, যেমন, কিসমিস, রসুন, খেজুর ইত্যাদি খাবার অভ্যাস রাখবেন।

(ঝ) বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন, ফলিক অ্যাসিড আর মিনারেল মস্তিষ্কের মেমরি সেন্টারকে সতেজ রাখে এবং স্মৃতিলোপ আটকাতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

(ঞ) ব্রাহ্মী শাক ও জিঙ্কো বাইলোবা স্মৃতিহ্রাস আটকাতে খুবই উপকারী।

ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিকার

Chapter -- 14

অত্যধিক সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক

সোস্যাল মিডিয়া বর্তমানে তাবৎ বিশ্ব-সমাজকে যুক্ত করে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু এর প্রতি অত্যধিক নির্ভরতা এখন অনেকেরই মাথা-ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। সমগ্র পৃথিবীতে এখন ২১০ মিলিয়ন নারী-পুরুষ মাত্রাছাড়া প্রযুক্তি-নির্ভরতার কারণে মনোবিকারের শিকার। যে সব কিশোর-কিশোরী দিনে ৫ ঘণ্টা তাদের স্মার্টফোনে সময় কাটায়, তাদের মাঝারি মাত্রার মানসিক অবসাদের শিকার হওয়ায় প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ডিজিট্যাল মিডিয়ায় আসক্তি বেশী দেখা যায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, বিশেষতঃ যারা একা একা থাকে। ৭০% লোক মোবাইল ফোনকে সঙ্গী করে বিছানায় যায়, যার কুপ্রভাবে দফারফা হয় তাদের ঘুমের। সোস্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় কাটানোর আনন্দ মানবমস্তিষ্কের 'রিওয়ার্ড সেন্টার'- এ প্রচুর পরিাণে ডোপামিন ঢুকিয়ে দেয়, যার প্রভাবে মানুষ আরো বেশী করে আসক্ত হয়ে পড়ে।

'উই আর সোস্যাল' নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের উপর একটি রিপোর্ট তৈরী করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ ফিলিপিনস্ গড়ে দৈনিক ৫.২ ঘণ্টা কম্পিউটারে আর ৩.২ ঘণ্টা স্মার্টফোনে সময় কাটায়। এই সারণীতে অন্যান্য দেশগুলো হল ক্রমান্বয়ে ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, আরব আমীরশাহী, মালেশিয়া, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও সাউথ আফ্রিকা।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সোস্যাল মিডিয়ার কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। সম-মনস্ক লোকজনেরা এর মাধ্যমে একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। দম্পতিরা মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে পারে। অনেকে ফিরে পেতে পারেন তাদের হারানো বন্ধুত্ব। অ্যানড্রয়েড ফোন হেলথ্ অ্যাপ-এর মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য-সচেতন হতে পারি। এসব নানা ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ডিজিটাল জগতে আমাদের কিশোর-কিশোরীরা ভয়ানক স্বাস্থ্য-সমস্যার শিকার হচ্ছে। এর কুপ্রভাবে ছেলে-মেয়েরা বাস্তব জীবনে সামাজিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। হারিয়ে ফেলছে আবেগগত ভারসাম্য। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, অনিদ্রা, টেনশন, ওবেসিটি, ম্যুড স্যুইং, মানসিক ক্লান্তি, আরো কত কি! ইংল্যান্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ্'- এর সমীক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মোবাইল আসক্তির কারণে মানসিক অবসাদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তাদের রিপোর্টে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির নেতিবাচক প্রভাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কি কি লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনি সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত

১. আপনি যদি দু'-দশ মিনিট অন্তর-অন্তর মোবাইল ফোনে ইনবক্স মেসেজ, হোয়াট্স-অ্যাপ মেসেজ, নোটিফিকেশন চেক্ করেন, বুঝবেন আপনি সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত।

২. ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অবসর সময়ের পুরোটাই যদি সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ব্যয় করে, বুঝতে হবে তারা এতে অতিরিক্ত আসক্ত। হোমওয়ার্ক অ্যাসাইমেন্ট তৈরী করা ভুলে, খেলাধূলা ছেড়ে যে সব শিক্ষার্থী ফেসবুক বা ইউ-টিউবে মজে থাকে, তারা প্রবলভাবে আসক্তির শিকার।

৩. সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিরা বেশীক্ষণ ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে বা ওয়াই-ফাই সুবিধা ব্যাহত হলে, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়ে টেনশন ও অবসাদের শিকার হয়ে পড়ে।

৪. যারা ৩-৪ ঘণ্টার বেশী সোস্যাল মিডিয়ায় সময় কাটায়, তারা 'ক্লিনিক্যালি অ্যাডিক্টেড'। এরা তুচ্ছ অনেক জিনিস যেমন, ঘুম থেকে ওঠার সময়, লাঞ্চ ও ডিনার টাইম, কেনাকাটার খুঁটিনাটি ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে অভ্যস্ত।

৫. আপনি আপন মনে স্মার্টফোন ঘেঁটে চলেছেন, একই ঘরে বসে বাড়ীর অন্যেরা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন – এর অর্থ আপনার আসক্তি অনেক গভীরে। এই ধরনের লোকেরা বাস্তব জগৎ থেকে ভার্চুয়াল জগতের খবরাখবর বেশী রাখে।

৬. বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে ভুলে গেলে যাদের 'আইসোলেশন ফোবিয়া' দেখা দেয়, তারা

আসলে ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রবলভাবে আসক্ত। এরা অল্পদিনের ছুটিতে বাড়ীর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় ল্যাপটপ নিয়ে যেতে ভুলে গেলে বুক ধড়ফড়ানির শিকার হয়ে পড়ে।

৭. সোস্যাল মিডিয়ায় প্রবল আসক্তির কারণে অনেকে আজকাল কথাবার্তার মধ্যে 'হ্যাশ ট্যাগ', 'ইনবক্স', 'ট্যুইট', 'আপডেট' ইত্যাদি শব্দবন্ধ বারংবার ব্যবহার করে। এই ধরনের লোকেরা নিজের পোষা কুকুরের নামেও ফেসবুকে বা ট্যুইটারে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখে।

৮. আপনি যদি ঘন ঘন আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাস আপডেট করতে থাকেন এবং সেটা যদি অবসেসন-এর পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি ডিজিটাল মিডিয়ায় আসক্ত। এই ধরনের আসক্তি-প্রবণ লোকজন টয়লেট বা ওয়াশরুমে ঢোকার সময়ও মোবাইল ফোন সঙ্গে নেয়।

৯. সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত লোকজন মনে করে, তাদের যে সব বন্ধুদের হোয়াটস-অ্যাপ বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই – তারা অসামাজিক জীব। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট স্বীকার না করলে এইসব লোকজন স্ট্রেস্ ও টেনশনের শিকার হয়ে পড়ে। এরা অনেকে অন্যের সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকউন্টে গোপনে নজরদারী চালায়।

১০. ব্যাঙ্কের চেক-বুকে সই করার সময় আপনি যদি আপনার ট্যুইটার হ্যান্ডেল-এর নাম লিখে বসেন, বাস্তব জগতের থেকে অনলাইনে যদি আপনার বন্ধুর সংখ্যা বেশী থাকে, মাঝরাতে উঠে উঠে যদি আপনার 'আপডেট্' ও 'কমেন্ট' চেক্ করার অভ্যাস থাকে – তাহলে আপনি অবশ্যই সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত।

সোস্যাল মিডিয়ায় অত্যধিক আসক্তি কাটাবেন কিভাবে

১. সীমিত পরিমাণে ফেসবুক, ট্যুইটার, ইউ-টিউব, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করুন। দিনে সর্বাধিক এক ঘণ্টা সোস্যাল মিডিয়ায় সময় কাটান।

২. আপনার দৈনন্দিন রুটিনের পক্ষে ক্ষতিকর সোস্যাল মিডিয়া নোটিফিকেশনগুলো বন্ধ করে দিন। এতে বাস্তব জীবনের কাজকর্ম গুছিয়ে করতে আপনার অনেক অনেক সুবিধা হবে। অনলাইন ইন্টারনেট জগতে যা কিছু ঘটছে, তা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন। গ্যাজেট নোটিফিকেশন বন্ধ না করলে আপনার মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হবেই।

৩. অবসর সময়ে মোবাইলের পর্দায় চোখ না রেখে বাস্তব-সম্মত নতুন কোনো হবি বেছে নিন। এতে আপনার ম্যুড স্যুইং ঠিক হয়ে যাবে, বৃদ্ধি পাবে আপনার কর্মদক্ষতা।

৪. ভার্চুয়্যাল জগতের ফাঁদ থেকে বেরুনোর চেষ্টা করুন। সপ্তাহান্তে দু'দিন সোস্যাল অ্যাকাউন্ট সাইন-অফ করে রাখুন। পরিবর্তে ভালো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন, সম্মিলিতভাবে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করুন। স্মার্টফোন আর কম্পিউটার স্ক্রীনের পিছনে বাস্তব জীবনের যে সব বর্ণ-গন্ধ তাদের রসাস্বাদন করুন।

৫. জীবনের সবকিছুই সেলফির মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করবেন না। নিজের ভালো কাজের মাধ্যমে বরং আত্মীয়-বন্ধুদের মনের মণিকোঠায় স্থান পাবার চেষ্টা করুন।

৬. সোস্যাল মিডিয়ায় অস্বাস্থ্যকর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিৎ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ট্যুইটার প্রভৃতি সোস্যাল মিডিয়া প্রোফাইল মুছে ফেলা। শিক্ষার্থীর বরং অবসর সময়ে মোটিভেশনাল বুক বা মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ পড়ুক।

অভিভাবকদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ

টিভি-র সামনে বসিয়ে বা মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে বাচ্চাকে খাবার খাওয়াবেন না। বাচ্চার কান্না থামানোর জন্যে তার হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেবেন না। অবসর সময়ে টিভি-র কার্টুন নেটওয়ার্ক, বা অ্যানিমেশনের অ্যাকশন থ্রিলার যেন ছোটদের একমাত্র সঙ্গী হয়ে না ওঠে। বেশীক্ষণ স্মার্টফোনে ভিডিও গেম খেললে ছোটদের মস্তিষ্কে প্রভূত ক্ষতি হয়। বাচ্চার মধ্যে দেখা দেয় অতিরিক্ত রাগ, বদমেজাজ, অতি-চঞ্চলতা ও অন্যান্য নানান আচরণগত আগ্রাসন। এসব থেকে রক্ষা পেতে সন্তানের সাথে বন্ধুর মতো মেলামেশা করুন। গৃহবন্দী করে না রেখে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেলামেশার সুযোগ করে দিন। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সবুজ মাঠে খেলাধূলার সুযোগ করে দিন। ইন্টারনেটে অ্যাডাল্ট ভিডিও থেকে কৈশোরে অনেকেই শিকার হয় যৌন অপরাধের। 'ব্লু-হোয়েল' বা 'মোমো' জাতীয় স্যুইসাইড গেম ছোটদের আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করে। এতে পড়াশোনা আর মানসিক ভারসাম্যর যে দফারফা হয়, তা আজ আর কারো অজানা নয়। বিচক্ষণ অভিভাবকগণ তাই সন্তানের হাতে কিছুতেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন তুলে দিতে চান না। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, খুব ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দিলে তাদের কথা বলা শিখতে দেরী হয়, চোখের দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়,

মনোযোগের সমস্যা দেখা দেয়, দেখা দেয় ঘুমের সমস্যা। এছাড়া মোবাইল রেডিয়েশন থেকে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সচেতনতার কথা মাথায় রেখে সর্বদা ছোটদের স্মার্টফোন থেকে দূরে রাখুন।

Chapter -- 15

শিশুদের বর্ধিত মানসিক চাপ

বর্তমান অবক্ষয়িত মূল্যবোধের যুগে বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও নানান ধরনের মানসিক চাপ নিয়ে বাঁচতে হয়। পিতা-মাতার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুরা আজ বলির পাঁঠা। লক্ষ্যে পৌঁছনোর ইঁদুর দৌড়ে শামিল করে আমরা বড়োরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সরলমতি শিশুদের শৈশবকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছি – কিশলয় মন হয়ে পড়ছে মানসিক অবসাদের শিকার।

শিশুদের কেন এত মানসিক চাপ

১. অ্যাকাডেমিক প্রেশার – নিচু ক্লাশের শিশুরা মাত্রাতিরিক্ত ভারী সিলেবাস, হোম-টাস্ক, প্রোজেক্ট ইত্যাদির চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত। স্কুল ছাড়াও সকাল-বিকালে তিন-চার জায়গায় পড়তে যাওয়া – সব মিলিয়ে তার খেলাধূলার সময়টুকু চুরি করে নেয়।

২. এক্সট্রা-কারিক্যুলার অ্যাক্টিভিটি – পড়াশুনা ছাড়াও ছোট শিশুদের আমরা নিয়ে যাচ্ছি নাচের বা গানের ক্লাশে কিংবা ক্যারাটে শেখাতে। এত কাজের চাপ শিশুমন নিতে পারে না।

৩. স্কুল প্রেশার – কাঙ্খিত রেজাল্ট না করতে পারলে, বাবা-মায়ের কাছে বকুনি। লেখাপড়ায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেয়ে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার ভয়ে বয়ঃসন্ধির বালক-বালিকাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

৪. ইলেকট্রনিক গ্যাজেট – মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির এই সহজলভ্য যুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে-চুরিয়ে নানান বিকৃত অ্যাডাল্ট কনটেন্ট দেখতে দেখতে মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

৫. পেরেন্টাল স্ট্রেস – পিতা-মাতার মধ্যেকার ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য শিশুমনে কুপ্রভাব ফ্যালে। বাবা-মায়ের মধ্যে যদি ডিভোর্স হয়ে যায়, তাতে সন্তানের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। দারিদ্র, অর্থনৈতিক সমস্যাও মানসিক চাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে।

৬. ক্রনিক ইলনেস – বাচ্চার যদি অ্যাজমা, ওবেসিটি, এ.ডি.এইচ.ডি ইত্যাদি থাকে তাহলে সে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে না – ফলতঃ মানসিক চাপে ভুগতে থাকে।

৭. একাকীত্ব – নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে আজকাল একটিমাত্র সন্তান। বাবা-মা ব্যস্ত কর্মক্ষেত্রে। সন্তানকে সময় দেবার কেউ নেই। ফলে সে হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের শিকার। সেই মানসিক চাপ নিতে না পেরে বাচ্চারা হয়ে পড়ছে অসহিষ্ণু, উদ্ধত, খিটখিটে মেজাজের।

৮. স্কুল ফোবিয়া – স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমত না পারলে, বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করার আশঙ্কা হলে, স্কুলে শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়ার ভীতি থেকে শিশুরা স্কুলে যেতে চায় না। তাকে নিয়ে স্কুলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে, তার পরদিন থেকে বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না। এইসব মানসিক চাপ থেকে শিশুরা ডিপ্রেসিভ মুড সিনড্রোম-এ আক্রান্ত হয়।

৯. শরীরচর্চার অভাব – নানা কারণে শিশুদের শচীরচর্চার সময় হয়ে ওঠে না। অনেক বাবা-মায়েরা এ ব্যাপারে তাদের যথাযথভাবে উৎসাহিত করেন না। ফাস্ট-ফুড, জাঙ্ক-ফুড খেয়ে বাচ্চারা মোটা হয়ে যাচ্ছে- যার ফলশ্রুতিতে তাদের দেহে-মনে দেখা দিচ্ছে নানাবিধ বিকার।

১০. সাংস্কৃতির কারণ – আমরা এখন এক চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে বাস করছি। এর ফলে বয়ঃসন্ধিকালের একটি ছেলে বা মেয়ে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে বিকৃতির দীক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তার অবচেতন মনে গৃহীত সেইসব বিকৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ সে উদ্বেগ ও উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। মানসিক এই স্বাস্থ্যহানির কারণে কেউ কেউ বাস্তব থেকে পালিয়ে কল্পনার জগতে বাস করতে করতে স্কিজোফ্রেনিয়া-য় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেউ বা আবার অপরাধপ্রবণ হয়ে অবশেষে অ্যান্টিসোস্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার-এর শিকার হয়ে পড়ে। অনেকে আবার না-পাওয়ার হতাশা থেকে অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

মানসিক চাপে শিশুরা কেমন আচরণ করে

মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে শিশুরা পাড়ায় বা স্কুলে বিবিধ অস্বাভাবিক আচরণ করে ফ্যালে। স্কুলের বন্ধুবান্ধব বা পাড়ার পরিচিতদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বাড়ীতে হঠাৎ হঠাৎ রেগে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব দেখা যায়। কেউ কেউ আবার হঠাৎ হঠাৎ কান্না ও যে কোনও প্রত্যাখানেই খুবই মুষড়ে পড়ে। মানসিক চাপের কুপ্রভাবে শিশুরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ডুবে যায়। ঘুমের সমস্যার পাশাপাশি স্টোম্যাক পেইন, বমিভাব, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদিও হতে পারে।

মানসিক চাপ থেকে শিশুদের স্বাস্থ্য-সমস্যা

১. টেম্পারামেন্ট ডিসঅর্ডার – অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে শিশুদের বদমেজাজের মত মনোবিকার দেখা দেয়। বাচ্চারা প্রচণ্ড রাগী হয়ে ওঠে। যা বায়না করে তখনই তা না পেলে হাতের সামনে যা জিনিসপত্র পায়, তা ভাঙতে শুরু করে। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে, অনেকে আবার বাবা-মায়ের গায়ে হাতও তোলে। বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থেরাপির সাহায্যে বাচ্চাদের এই ধরনের অস্বাভাবিক আচার-আচরণগুলো অনেকাংশে প্রশমিত করা যায়।

২. স্কিজো-অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার – এতে শিশুরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, খেলাধূলায় তার আর মন বসে না। নিজেকে গুটিয়ে নেয়, অল্পেই বিরক্ত হয়ে পড়ে। তার কাজকর্ম ও আবেগ প্রকাশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। পজেটিভ রি-ইনফোর্সমেন্ট থেরাপির সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩. অ্যাটেনশান ডিফিসিট হাইপার-কাইনেটিক সিনড্রোম – মাত্রাছাড়া মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে বাচ্চারা অতি-চঞ্চলতা ও মনঃসংযোগের সমস্যায় ভোগে। এতে শিশুদের শিখন-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরা পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের অবাধ্য হয়। বিহেভিয়ার ইন্টারভেনশান পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৪. অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার – মানসিক চাপে বিপর্যস্ত শিশুরা অমূলক ভয়ের শিকার হয়ে পড়ে। এই সমস্যা থেকে মাথাব্যথা, পড়াশোনার আগ্রহের অভাব ও মনোযোগের সমস্যা হতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপীর সাহায্যে এ সমস্যা প্রতিকার করা যায়।

৫. ইটিং ডিসঅর্ডার – মানসিক চাপে ভারাক্রান্ত শিশু অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা-য় আক্রান্ত হয়। এদের ক্ষুধামান্দ্য ও খাবারে রুচির অভাব দেখা দেয়। ইন্সট্রুমেন্টাল কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে এর সমাধান করা যায়।

৬. স্লিপ টেরর ডিসঅর্ডার – বিবিধ চাপের ধকল সইতে না পেরে শিশুরা নিদ্রাহীনতার শিকার হয়। ঘুম সংক্রান্ত এই ধরনের বিশৃঙ্খলায় ছেলে-মেয়েরা মাঝপথে ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৭. ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস – মানসিক চাপে বিপন্ন শিশুদের ডিপ্রেশনের অ্যাকিউট অ্যাটাক হতে পারে। তখন অযথা রাগ, অপরাধপ্রবণতা, লেখাপড়ায় অমনোযোগ, খাবার-দাবারে অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাইকোথেরাপী ও অ্যান্টি-ডিপ্রেসিভ ড্রাগ-এর সাহায্যে এর চিকিৎসা করা হয়।

সন্তানের মানসিক চাপ প্রশমনে পিতা-মাতার করণীয়

গুড পেরন্টিং-এ অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনিই আপনার শিশু-সন্তানের প্রথম রোল মডেল। পিতা-মাতার সততা, সদ্ব্যবহার ও অন্যান্য ভালো গুণ কালক্রমে শিশুমনে সঞ্চারিত হয়। সেজন্য তার সাথে ব্যবহার করার সময় কখনোই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেবেন না। আপনাদের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করার জন্য শিশুদের উপর অযথা প্রত্যাশার চাপ তৈরী করবেন না। এমনিতেই পড়ার চাপ, স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেকার রেষারেষি, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড় ইত্যাদির চাপে সরল অনভিজ্ঞ শিশুমন বিপর্যস্ত।

সন্তানের বর্ধিত মানসিক চাপ প্রশমনে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন

১. ঐকান্তিক স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে শিশুকে মানুষ করুন। তার ছোট ছোট ভালো কাজের প্রশংসা করুন। আপনার সন্তান যেন পরিবার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সবার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে।

২. ছেলেবেলা থেকে সন্তানকে শৃঙ্খলাপরাণতার শিক্ষা দিন। শৈশব থেকেই তার মানসিক মূল্যবোধের বিকাশে নজর রাখুন।

৩. শিশু-সন্তানকে সময়ে-অসময়ে অতিরিক্ত শাসন করা উচিত নয়। আপনি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করবেন বা তাকে যা-যা করতে আদেশ দেবেন – তার মধ্যে যেন সঙ্গতি থাকে। অতিরিক্ত সমালোচনা, অন্যায় শাসন, তিরস্কার বা নিষ্ঠুর আচরণ শিশুমনকে অবাধ্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলতে পারে।

৪. কখনোই শিশুকে বলবেন না, তোমার দ্বারা এটা হবে না বা তুমি ওটা করতে পারবে না। তার নিজের ভুল থেকে তাকে শিখতে দিন, আপনারা শুধু তার ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে শুধরে দেবার চেষ্টা করুন।

৫. বাইরের লোকজনের সামনে কখনোই আপনার সন্তানকে ভর্ৎসনা করে খাটো করবেন না। তাকে আপনি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আর ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে শেখান। ধর্মচর্চার সাথে জড়িত অন্ধ কুসংস্কার ও মিথ্যা অমূলক ভয়ের কবল

থেকে শিশুকে আড়াল করে রাখুন।

৬. বাড়ীতে যখন-তখন ঝগড়াঝাঁটি হলে শিশুদের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। গৃহের পরিবেশে দ্বিচারিতা, অশান্তি বা মাদকাশক্তির চল থাকলে আপনার শিশু আশ্রয়হীন ও আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। পিতা-মাতার মধ্যেকার মনোমালিন্য ও অশ্রদ্ধার সম্পর্ক শিশুমনে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়।

৭. সন্তানকে দুধ-ঘি-ফলমূল খেতে দিন। কোল্ড ড্রিঙ্কস, জাঙ্ক-ফুড ও ফাস্ট-ফুড থেকে দূরে রাখুন। তাদেরকে প্রতিদিন খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উৎসাহ দান করুন। এতে শরীর ও মনের বিকাশ ঘটে এবং শিশুমনে অনেক উৎসাহ ও এনার্জির জন্ম দেয়। মনে রাখবেন, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত পানাহার সুস্থ-শরীর ও মনের চাবিকাঠি।

Chapter -- 16

ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিকার হোমিওপ্যাথিতে

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে নানাবিধ সমস্যার কথা অভিভাবকদের মুখে শুনি। বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগের সমস্যা ছাড়াও প্রায়শই শুনি অস্বাভাবিক আচরণের বিকার-জনিত সমস্যার কথা। বিগত ১৫ বছর ধরে স্নায়ুরোগ ও মনোরোগের চিকিৎসা করার সুবাদে শিক্ষার্থীদের বিবিধ লার্নিং ডিসএবিলিটি ও অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার-এর সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ও হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেণ্ট করে চলেছি। কেউ বলেন, আমার সন্তান শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে অপারগ বা মানসিক আঘাত-জনিত কারণে সে অস্বাভাবিক আচরণ-মূলক রোগের শিকার। অনেকে বলেন, ছেলের মধ্যে তাঁরা স্কুলভীতি, পরীক্ষাভীতি ও একাগ্রতার অভাব লক্ষ্য করছেন বা সে কাল্পনিক ভয়ের কথা বলছে অথবা তার মধ্যে অপরাধী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ইত্যাদি। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ও অস্বাভাবিক আচরণ-সংক্রান্ত এইসব নানাবিধ সমস্যার প্রতিকার কোন্ পথে, তা নিয়ে বিশদে আলোকপাত করার প্রয়াস করলাম।

প্রঃ- ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণ বলতে কি বোঝায়?

অনেকে আছে যাদের মনঃসংযোগ ও অ্যাটেনশান-এর সমস্যার জন্যে শিখন-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্কুল ফোবিয়া থেকে অনেকের স্কুল-পালানোর প্রবণতা দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক-মহাশয়দের অবাধ্য হয়। অনেকে মিথ্যা-ভাষণে পটু হয়, কেউ কেউ আবার আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলে। এছাড়া, চুরির বাতিক, বদমেজাজ বা সহপাঠীদের প্রতি হিংসা-দ্বেষ পোষণ ইত্যাদি অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর অনেক মা-বাবার আছে।

প্রঃ- স্কুল ফোবিয়া কি? এর প্রতিকার কিভাবে করা যায়?

যে সব ছেলে-মেয়েরা স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমত পারে না, বাৎসরিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার আশঙ্কায় ভোগে অথবা স্কুলে সহপাঠী বা শিক্ষক মহাশয়দের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়ার ভীতি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে চায় না। স্কুল-সংক্রান্ত এসব নানা ধরণের ভীতিকে এককথায় স্কুল ফোবিয়া (School Phobia) বলা হয়। ডিপ্রেসিভ মুড সিনড্রোম-এ বিপর্যস্ত ছেলে-মেয়েরা স্কুল ফোবিয়া-তে আক্রান্ত হয়। এর প্রতিকারে সাইকোথেরাপি বা সাইকিয়াট্রিক ইনটারভেনশান সাধারণত প্রয়োজন হয় না। স্কুলভীতি কাটানোর জন্য স্কুলের পরিবেশে নজর রাখতে হবে, যেন ছাত্র-ছাত্রীরা অপমানিত বোধ না করে বা নিরাপত্তার অভাব অনুভব না করে। এরকম ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ ও স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সম্মিলিত ঐকান্তিক প্রয়াসে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে শৈশব ও কৈশোরের স্কুলভীতির প্রতিকার করা যায়।

প্রঃ- অস্বাভাবিক আচরণ প্রসঙ্গে আজকাল এ.ডি.এইচ.ডি. (ADHD) আর ইনফ্যানটাইল অটিজম (Infantile Autism)- এর কথা প্রায়ই শোনা যায়। এদের লক্ষণ ও প্রতিকার কিভাবে করা যায়?

১. এ.ডি.এইচ.ডি-র পুরো কথা হল অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপার একটিভ ডিসঅর্ডার। ADHD-তে আক্রান্ত অস্থিরমতি বাচ্চারা অতিমাত্রায় চঞ্চল প্রকৃতির হয় ও অকারণে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে। স্কুলের শিক্ষক মহাশয় ও বাড়ীতে বাবা-মায়েরা এদের সম্পর্কে মনঃসংযোগের ঘাটতির অভিযোগ করেন। স্বভাবে এরা খামখেয়ালী ও বদমেজাজের হয়ে থাকে, অনেককে অভিভাবক বা শিক্ষক মহাশয়দের অতি অবাধ্য হতে দেখা যায়, কারুর কারুর আবার অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা থাকে। শৈশবের ব্রেণ ইনজুরি বা

মেনিনজাইটিস-এর কারণে এই ধরণের হাইপারকাইনেটিক ডিসঅর্ডার হতে পারে। এডুকেশনাল কাউন্সেলিং ও সাইকিয়াট্রিক এ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন-এর সাহায্যে এর প্রতিকারের প্রয়াস করা হয়।

২. ইনফ্যানটাইল অটিজম-এ মেয়েদের থেকে ছেলেদের আক্রান্ত হবার প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এইসব বাচ্চারা একা থাকতে ভালোবাসে, অন্যদের সাথে মিশতে পছন্দ করে না, অনেকের আবার কোনো খেলার সরঞ্জামে আগ্রহ থাকে না বা খেলাধূলার প্রতি কোনো ঝোঁকও থাকে না। Autism-এর বাচ্চাদের আপাতদৃষ্টিতে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হলেও, বয়সের অনুপাতে এদের বুদ্ধি পরিণত হয়ে থাকে। এরা কম কথা বলে, কাজে অমনোযোগী হয় এমনকি চারপাশের সবকিছু এদের কাছে আকর্ষণহীন মনে হয়। বিহেভিয়ার থেরাপীর সাহায্যে অটিজম-এর বাচ্চাদের অস্বাভাবিক আচরণগুলো অনেকটা কমানো যায়। এমন ধরণের সন্তান থাকলে, বাবা-মাকে স্পেশ্যাল এডুকেশন-এর সাহায্যও নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে হাইপারকাইনেটিক সিনড্রোম (Hyperkinetic Syndrome) -এর কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আচরণ-সংক্রান্ত এই সমস্যায় বাচ্চারা সহজে রাগে ফেটে পড়ে, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতে পারে না। মোটর নার্ভ ও সেন্সরি নার্ভের সমন্বয়ের অভাবের জন্যে এই ধরণের শিশুরা অস্থিরমতি, আবেগ-প্রবণ ও বদমেজাজী হয়ে থাকে, কেউ কেউ হতাশা সহ্য করার সামর্থ্য হারিয়ে ফ্যালে। মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার অসংগতির জন্যে উদ্ভুত এই সমস্যাটির বিহেভিয়ার ইণ্টারভেনশান ও সাইকিয়াট্রিক মেডিকেশান-এর সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

প্রঃ- অপরাধ-প্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাব পরিবর্তন করা যাবে কিভাবে?

যারা জেদী, নিষ্ঠুর, স্নেহশূন্য অতিশয় বদমেজাজী বা যাদের ক্লেপটোম্যানিয়া বা চুরির বাতিক থাকে – তাদের আমরা ক্রিমিন্যাল বিহেভিয়ার প্রোন চাইল্ড (Criminal Behaviour-prone Child) বলি। এরা কারণে-অকারণে মিথ্যা কথা বলে, বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অসৌজন্য প্রকাশ করে, কেউ কেউ এরা সমবয়সীদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, এমনকি অল্প বয়সে যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এদের অনেকের স্কুল পালানোর প্রবণতা থাকে। ভালো সাইকোথেরাপিস্ট-এর মধ্যস্থতায় এই ধরণের অপরাধ-প্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়।

প্রঃ- শৈশবের বদমেজাজ একটি সমস্যামূলক মানসিক বিকার। এর প্রতিকারের উপায় কি?

এটাকে আমরা টেম্পারামেণ্ট ডিসঅর্ডার্স (Temperament Disorders) বলি। এরা খুব রাগী আর খামখেয়ালী প্রকৃতির হয়। এরা যখন যা বায়না করে তখনই তা না পেলে রেগে তুলকালাম করে-- হাতের সামনে জিনিসপত্র যা পায় তা ছুঁড়ে মারে, ছিঁড়তে বা ভাঙতে থাকে। কেউ কেউ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে বা দেওয়ালে মাথা ঠোকে, মা-বাবার গায়ে হাত তোলে, অনেকে এমনকি মুখ খারাপও করে বসে। এদের বুদ্ধিবৃত্তি যে অপরিণত হয় তা নয়, কিন্তু উত্তেজিত স্বভাবের জন্যে এদের কোনোকিছু শেখানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রফেশনাল সাইকোথেরাপিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর কাছে নিয়ে গিয়ে এদের কাউন্সেলিং-নির্ভর চিকিৎসা করালে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

প্রঃ- শৈশব ও কৈশোরের বিষন্নতা আর খেদোন্মত্ততা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করা যাবে কিভাবে?

ছোটদের অনেকের ম্যানিয়াক সাইকোসিস হতে দেখা যায়। আবার অনেক শিশুদের মধ্যে ডিপ্রেশনের অ্যাকিউট অ্যাটাক হতেও শোনা যায়। এই দুই ধরণের সাইকোসিস-কে একযোগে আমরা ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (Maniac Depressive Psychosis) বলি। এর থেকে অকারণে রাগ, পড়াশোনায় অমনোযোগ, অপরাধপ্রবণতা, খাবার-দাবারে অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকট হয়। এর প্রতিকারে ইনডিভিজুয়াল ও ফ্যামিলি সাইকোথেরাপি খুব কাজে আসে। ক্ষেত্রবিশেষে, অ্যান্টি-ডিপ্রেসিভ এ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন-ও ব্যবহার করা হয়।

প্রঃ- স্লিপ ডিসঅর্ডার-এ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ক্ষতি হয়। কিপদ্ধতিতে এর সমাধান করা যায়?

ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে অতিরিক্ত ঘুমের অভ্যাস-বশতঃ ১২-১৩ ঘণ্টাও ঘুমায় বা সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত নিদ্রা যায়। এটা হাইপারসমনিয়া (Hypersomnia) -র সমস্যা। কেউ কেউ রাত্রে কল্পনায় শুয়ে ছটফট করে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। ঘুম অল্প হওয়ার জন্যে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ক্লান্তি অনুভব করে। এটা হল ইনসমনিয়া (Imsomnia)-র সমস্যা। নার্কোলেপ্সি (Narcolepsy) হল যখন-তখন দিনের বেলায় ঘুমানোর একটি খারাপ অভ্যাস। এরা ঘুমের মধ্যে ভয়ানক বিভৎস সব স্বপ্ন দ্যাখে যাকে ডাক্তারি ভাষায় আমরা বলি হিপনোগগিক হ্যালুসিনেশান। অভিভাবকরা অনেকে এসে আমাদের বলেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা রাত্রে মাঝপথে ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এটি ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ ও দুঃস্বপ্ন-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার সমস্যা যাকে আমরা স্লিপ টেরর ডিসঅর্ডার (Sleep Terror Disorder) বলে থাকি। কেউ কেউ, শুনে থাকবেন, ঘুমের ঘোরে উঠে ঘরের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ায়, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে যায়, এমনকি বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যেতেও শোনা যায়। ডাক্তারী পরিভাষায় এর নাম স্লিপ ওয়াকিং বা সমনামবিউলিজম (Somnumbulism)। কিন্তু ঘুমের সমস্যার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল স্লিপ অ্যাপনিয়া (Sleep Apnea), যাতে মোটাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার পাশাপাশি শ্বাসকার্যের ব্যাঘাতও হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম-এ ঘুমের মধ্যে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিদ্রা-সংক্রান্ত এ সমস্ত নানান সমস্যা কাউন্সেলিং ও ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

প্রঃ- জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্সি (Juvenile Delinquency) কি ছেলে-মেয়েদের আচরণ-সংক্রান্ত সমস্যা? এর প্রতিকার কিভাবে?

হ্যাঁ, এটা কৈশোর বয়সের একটা বড়ো আচরণগত সমস্যা। এরা গুরুজনদের অবাধ্য হয়, মিথ্যাভাষণে পটু হয় আর বয়োজেষ্ঠ্যদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে। এরা কথায়-কথায় মেজাজ হারায়, অন্যদের অধিকারগুলোকে হেলায় অবজ্ঞা করতে ভালোবাসে, অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে ও যৌন আগ্রাসনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমরা রেসিপপ্রোক্যাল ইনহিবিশান টেকনিক-এর সাহায্যে মুড ডিসঅর্ডার-এর চিকিৎসা করাতে বলি। তাছাড়াও, ক্রাইসিস ইণ্টারভেনশন ও সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপীর সাহায্যে এই ধরণের কণ্ডাক্ট ডিসঅর্ডার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রঃ- ইটিং ডিসঅর্ডার-এর রকমভেদ কি কি? কিভাবে এর চিকিৎসা করতে হবে?

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা (Anorexia Nervosa) এবং ব্যুলিমিয়া নার্ভোসা (Bulimia Nervosa) -- এই দুটো হল ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য-বিষয়ক সমস্যা। অ্যানোরেক্সিয়া-তে বালিকা ও কিশোরীদের মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য ও খাবারে রুচির অভাব দেখা যায়। যদিও এরা খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল আলোচনা করে। টিভিতে রান্না শেখানোর অনুষ্ঠান দ্যাখে ও তা নিয়ে দস্তুরমতো চর্চা করে, কিন্তু খাবার বেলায় খায় যৎসামান্য। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে এরা কম খায় ও ব্যায়াম করে শরীরের মেদ ঝরানোর চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধির সময়কার শারীরিক পরিবর্তন ও যৌনতার বিকাশ-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে কিশোরীরা এই সমস্যার শিকার হয়। এদের জন্যে আমরা ইনস্ট্রুমেণ্টাল কণ্ডিশনিং পদ্ধতিতে সাইকোথেরাপি ও ফ্যামিলি কাউন্সেলিং-এর পরামর্শ দিই। বিপরীতক্রমে, ব্যুলিমিয়া হল কিশোর-কিশোরীদের মাত্রাতিরিক্ত পানাহারের অভ্যাস। রাত্রে পেট ভরে খাবার পরেও এরা বাড়ীর অন্যেরা ঘুমিয়ে পড়লে লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রীজে রাখা মিষ্টি ফল বা অন্য সুস্বাদু খাবার-দাবার না চিবিয়ে গপগপ করে খেয়ে থাকে। পাছে কেউ দেখে ফ্যালে এই ভয়ে ভালো করে চিবিয়েও খায় না। অ্যানোরেক্সিয়া নাভোর্সা-র মত এ ক্ষেত্রেও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাবার বা মোটা -মেদ হয়ে যাবার ভয় থাকে। অ্যাভার্সান থেরাপি ও ইনডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপি-র সাহায্যে এদের চিকিৎসা সুফলদায়ক।

প্রঃ- লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও কল্পনাপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যায় প্রতিকার কিভাবে করতে হবে?

অনেক বাবা-মায়েরা অভিযোগ করেন, আমার ছেলে বা মেয়ে সব সময় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে, লেখাপড়ায় একদম মন নেই বা খেলাধূলায়ও তার মন বসে না। এরা সামান্য কারণে বিরক্তি প্রকাশ করে, এদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়, অনেকের কাজকর্ম ও আবেগ প্রকাশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। এ সব হচ্ছে সিজো-অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার (Schizo-affective Disorder)-এর লক্ষণ। বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে এরা বেশীরভাগ সময় নিজেকে কল্পনার জালে জড়িয়ে রাখে। এই ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই কালবিলম্ব না করে অভিজ্ঞ সাইক্রিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে হবে। এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিতে এর কার্যকরী চিকিৎসা আছে। এছাড়া, থেরাপী বাই পজিটিভ রি-ইনফোর্সমেণ্ট পদ্ধতিও ক্ষেত্রবিশেষে ভালো কাজ দেয়।

প্রঃ- ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণের বিকার-জনিত এইসব নানাবিধ সমস্যার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

রোগনির্ণয়ের সুবিধার জন্যে প্রথমে আমরা প্যাথোলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করিয়ে নিই। আজকাল অ্যাডভান্সড হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেণ্ট-এর প্রয়োজনে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনসিস করে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন-এর সাথে সাথে আমরা থেরাপিউটিক মেডিসিনও প্রেসক্রাইব করে থাকি। যেমন ধরুন, ডিপ্রেসিভ মুড সিনড্রোমের কারণে ছেলে-মেয়েদের স্কুলভীতি দেখা দিলে ট্রিটিকাম রিপেন্স বা কার্বো অ্যানিম্যালিস-এর মধ্যশক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি ট্যারেন্টুলা হিস্পানেটা মাদার টিংচার বা মার্কিউরিয়াস সায়ানেটাস ট্রাইচ্যুরেশান ব্যবহার করা হয়। হাইপার-এ্যকটিভ ডিসঅর্ডারে আমরা যদি ব্রেণ ইনজুরি বা মেনিনজাইটিস-এর হিস্ট্রি পাই, সেক্ষেত্রে হেলিবোরাস নাইগার, ভেরেট্রাম ভিরিডি, ক্যালি অকজ্যালিকাম ইত্যাদি ওষুধের উচ্চশক্তি প্রয়োগ করা হয়। সাথে সিমিসিফিউগা রেসিমোসা মাদার টিংচার বা প্লাম্বাম আয়োডেটাম ট্রাইচ্যুরেশান ব্যবহার করা হয়। অনিদ্রার রোগীদের থেরাপিউটিক মেডিসিন হিসাবে আমরা ড্যাফেন ইণ্ডিকা বা প্যাসিফ্লোরা মাদার টিংচার খেতে বলি। অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে রেডিয়াম ক্লোরাইড, অ্যরাম মেটালিকাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্যারানয়েড বা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নির্বাচিত ওষুধ হিসাবে সাইপ্রিপিডিয়াম পিউবেসসেন্স, লিথিয়াম ফসফেট, ফেরাম পিক্রিকাম ইত্যাদি ওষুধের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু এসব ওষুধ নিউরো-সাইকিয়াট্রি-তে বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

Chapter -- 17

ছোটদের এ.ডি.এইচ.ডি. / অটিজম ও লার্নিং ডিসএবিলিটি বাড়ছে কেন?

ছোটদের অস্বাভাবিক আচরণ-সংক্রান্ত নানান সমস্যার কথা তাদের বাবা-মায়ের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কেউ বলেন, আমার সন্তান প্রচণ্ড অস্থির প্রকৃতির, লেখাপড়ায় অমনোযোগী। অনেকের মুখে শুনি, তাদের ছেলে-মেয়েরা অতিমাত্রায় বদমেজাজী ও সবার অবাধ্য। কেউ কেউ আবার শিখন-সংক্রান্ত মারাত্মক অসুবিধার কারণে সহজে লিখতে ও পড়তে শেখে না। এইসব বিবিধ সমস্যা নিয়ে অভিভাবকগণ যারপরনাই উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। ঘরে ঘরে বর্তমানে শিশু-সন্তানদের এ.ডি.এইচ.ডি (ADHD), ইনফ্যণ্টাইল অটিজম (Infantile Autism) আর লার্ণিং ডিসএবিলিটি (Learning Disability-LD) র সমস্যা বাড়ছে। অস্বাভাবিক আচরণ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত এইসব সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে থাকলো বিশদে আলোচনা।

● এ.ডি. এইচ. ডি (ADHD) কি?

●● অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপার-কাইনেটিক ডিসঅর্ডার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল এ.ডি.এইচ.ডি.। রোগের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে – এই ধরনের বাচ্চারা চঞ্চল প্রকৃতির হয়, অতিশয় অস্থিরমতি ও অকারণে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে। অ্যাটেনশান ও কনসেনট্রেশন-এর সমস্যার জন্যে এদের শিখন-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে সর্বত্র এদের সম্পর্কে মনঃসংযোগের ব্যাপারে অভিযোগ শোনা যায়। এরা খেয়ালী ও বদমেজাজী প্রকৃতির হয় এবং পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের অবাধ্য হয়। কারুর আবার অন্যের ক্ষতি করার মানসিক প্রবণতা থাকে। আপনার সন্তানের দৈনন্দিন খাবারে যে কৃত্রিম মিষ্টি (Artificial Sweetener), সিন্থেটিক ট্রান্স-ফ্যাট (Synthetic Trans Fat), কৃত্রিম গন্ধ (Artificial Flavour) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় – তার মধ্যেকার মারাত্মক ক্ষতিকারক কিছু রাসায়নিক থেকে এ.ডি.এইচ.ডি হতে পারে।

● ইনফ্যণ্টাইল অটিজম (Autism Spectrum Disorder - ASD) কি?

●● শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশী দেখা যায়। এরা কারুর সাথে মিশতে পছন্দ করে না, একা-একা থাকতে পছন্দ করে। এইসব বাচ্চাদের খেলার জিনিসে যেমন আগ্রহ থাকে না, তেমনি খেলাধূলা করার প্রতি ঝোঁকও থাকে না। বাহ্যদৃষ্টিতে এদের জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মনে হলেও, এরা কিন্তু বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পরিণত হয়ে থাকে। এরা কথা বলে কম, আর কেবল নিজের কাজ নিয়ে মশগুল থাকে। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এদের খুবই অসহ্য লাগে। পৃথিবীর সবকিছু এদের কাছে সম্পূর্ণ আকর্ষহীন মনে হয়, প্রক্ষোভ জীবনের দারিদ্র্য এদের কাছে সম্পূর্ণ আকর্ষণহীন মনে হয়, প্রক্ষোভ জীবনের দারিদ্র্য এদের সবকিছুর প্রতি অমনোযোগী করে রাখে। আপনার বাচ্চার টিফিন ও নিত্যকার খাদ্যাভাসে যে কৃত্রিম রঙ (Artificial Colour), হাই-ফ্রুকটোজ কর্ণ সিরাপ (High Fructose Corn Syrup), সিন্থেটিক প্রিজার্ভেটিভ (Synthetic Preservative) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় – তার ভিতরে থাকা বিশেষভাবে ক্ষতিসাধনকারী কয়েকটি কেমিক্যাল থেকে ছোটবেলায় অটিজম হতে পারে।

● লার্নিং ডিসএবিলিটি (Learning Disability-LD) কি?

●● শিখন প্রক্রিয়ার নানাবিধ সমস্যাকে এককথায় লার্ণিং ডিসএবিলিটি বলা হয়। ছোটদের কমবেশী ৪০-৫০ রকমের লার্ণিং ডিসএবিলিটি দেখা যায়। অ্যণ্টেরোগ্রেড অ্যামনেসিয়া (Anterograde Amnesia) -তে নতুন জিনিস শিখতে অসুবিধা হয় আর সদ্য শেখা জিনিসগুলো বাচ্চারা ভুলে যায়, সহজে মনে করতে পারে না। কণ্ডাকশন অ্যফেসিয়া (Conduction Aphasia)- তে ভাষাা বোঝা ও প্রকাশ করার সমস্যা দেখা দেয়, শব্দ উচ্চারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ডেভেলপমেণ্টাল ডিসলেক্সিয়া (Developmental Dyslexia)- তে ভাষা-সংক্রান্ত শেখার ক্ষমতার অভাব দেখা যায়। এই সমস্যায় ছোটদের লিখতে-পড়তে আর বানান করতে অসুবিধা হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর নতুন নতুন শব্দ চিনতে অনেক বেশী সময় লাগে, এরা সমবয়সীদের তুলনায় দেরীতে কথা বলতে শেখে। কথা বলার সময় এদের উপযুক্ত সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। অনেক বাচ্চার অক্ষর পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, কেউ কেউ আবার নিজের নাম বানান করে বলতে বা লিখতে সমস্যায় পড়ে। কারুর কারুর লেখায় কিছু কিছু অন্তর উল্টে-পাল্টে যায়, দুটি অক্ষরের মধ্যে মিল থাকলে তাদের প্রভেদ বুঝতে সমস্যা হয়। আইডিওকাইনেটিক অ্যাপ্রাকসিয়া (Ideo-Kinetic Apraxia) -তে শিশুরা যথাযথ শারীরিক অঙ্গচালনায় সড়গড় হতে পারে না।

যে অঙ্গভঙ্গি সে যে উদ্দেশ্যে দেখাতে চাইছে, তা সে পারে না। এই সমস্যা থাকলে শিশুরা খুব সহজ ড্রয়িং বা প্যাটার্ন দেখে নিজে তা আঁকতে পারে না। কেউ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দেখাতে বললে শিশু তা পারে না। ফাংশনাল অ্যাগনসিয়া (Functional Agnosia)- তে শিশু তার অনুভূতি যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনকি তার চারপাশের পরিচিত জিনিসপত্রও চিনতে পারে না। অনেকে আবার পরিবারের লোকজনদেরও চিনতে সমস্যায় পড়ে। এই সমস্যায় অনেক শিশু পরিচিত আওয়াজ বা আগে শোনা শব্দ ঠিকঠাক চিনতে পারে না। অনেক শিশুদের রঙ-স্বাদ-গন্ধ চিনতে অসুবিধা হয়। শিশুখাদ্যে ব্যবহৃত নানা ক্ষতিকর ফুড অ্যাডিটিভ (Food Aditive) ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য মোনো-সোডিয়াম গ্লুটামেট (Monosodium Glutammate-MSG), টেক্সচার বৃদ্ধিকারী উপাদান (Texure Enhancing Chemicals) ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত বাচ্চাদের শরীরে প্রবেশ করলে এইসব বিভিন্ন ধরণের লার্ণিং ডিসএবিলিটি দেখা দিতে পারে।

● **দৈনন্দিন খাবারের সাথে কি ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক শরীরে গেলে ছোটরা এইসব সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে?**

●● প্রায় সব ধরনের প্রসেসড্ ফুড-এ ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে, যারা নানাভাবে ব্রেণ-সেল ও মস্তিষ্কের নিউরো-ট্রান্সমিশন মেকানিজমকে আক্রমণ করে। জাঙ্ক ফুড, সফট ড্রিঙ্কস্, বেকড্ ফুড, ফ্রুট ড্রিঙ্কস্, এনার্জি ড্রিঙ্কস্, ফাস্ট-ফুড মিল ইত্যাদিতে যে সব কৃত্রিম রঙ-গন্ধ-মিষ্টি-প্রিজার্ভেটিভ ব্যবহৃত হয় – তার মধ্যেকার সিন্থেটিক কেমিক্যাল থেকে এ.ডি.এইচ.ডি., অটিজম ও লার্ণিং ডিসএবিলিটি প্রভৃতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

১. **কৃত্তিম মিষ্টি (Artificial Sweeters)** – আমাদের খাদ্যাভাসে থাকা কেক্, প্যাসট্রি, বানস্, মাফিন, কুকিজ, সুগারি সফট্ ড্রিঙ্কস্, আইসক্রিম, চকোলেট, ক্যণ্ডি-বার ইত্যাদিতে কৃত্রিম মিষ্টি ব্যবহৃত হয়। যে সব রাসায়নিক কৃত্রিম মিষ্টি হিসাবে ব্যবহার হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – অ্যসপারটেম, স্যুক্রালোজ, অ্যসিসালাফেম পটাসিয়াম, অ্যাডভ্যনটেম, নিওহেসপেরিডিন ডিসি, ইত্যাদি। এইসব কেমিক্যাল মস্তিষ্কের ব্লাড-ব্রেণ বেরিয়ার-কে অতিক্রম করে ব্রেণ-সেলদের আক্রমণ করে। এর ফলে মস্তিষ্কে অ্যস্ট্রোসাইট সেল-এর সংখ্যা কমতে থাকে, মোনো-অ্যমাইন অক্সিডেজ নামক ব্রেণ এনজাইম-এর বিপাকক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়, ক্ষেত্রবিশেষে প্যপেজ সার্কিট-এর ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হয় ও সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার জিন-এর অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। যার ফলে অটিজমের নানান লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২. **সিন্থেটিক ট্রান্স ফ্যাট (Synthetic Trans Fatty Acid)** – ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল প্রসেস-এ হাইড্রোজেন-এর সাথে লিক্যুইড ভেজিটেবল অয়েল মিশিয়ে সলিড ফ্যাট তৈরী করা হয়। ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ভেজিটেবল অয়েল হিসাবে সোয়াবিন অয়েল, কটন-সীড অয়েল, ক্যনোলা অয়েল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। চট-জলদি খাবার হিসাবে ছোটদের টিফিন-এ দেওয়া ক্যুকিজ, কেক, পাই, বিস্কুট , ফ্রোজেন পিৎজা, মার্জারিন, পী-নাট বাটার, চকোলেট ইত্যাদিতে ক্ষতিকর সিন্থেটিক ট্রান্স ফ্যাট ব্যবহৃত হয়। এইসব ফ্যাটি অ্যাসিড বেশী মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে মস্তিষ্কের ইনফ্লামেটরি পাথওয়ে-তে অতিরিক্ত ইন্টারলিউকিন ও সাইটোকাইনিন জমা হয়। যার ফলে ব্রেণ-এর গ্লুটামেটার্জিক নিউরোণের মাইটোকনড্রিয়াগুলোতে এনার্জি উৎপাদন অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় অতি চঞ্চলতা ও মনযোগের অভাব। কিছুক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অর্বিটো-ফ্রণ্টাল কর্টেক্স-এ ডেকোসা হেক্সায়োনিক অ্যাসিড (DHA) -এর মাত্রা কমে যায়। ফলে দেখা দেয় আচরণগত আগ্রাসন, খিটখিটে মেজাজ আর বৃদ্ধি-মেধা-স্মৃতিসমস্যা।

৩. **কৃত্রিম গন্ধ (Artificial Flavours)** – খাবার হিসাবে ছোটদের আমরা যে আইসক্রিম, চকোলেট, নানান ডেজার্ট, কুলফি, বিরিয়ানি, ক্যানড ফ্রুট, নরম পানীয় ইত্যাদি খেতে দিই, তাতে কৃত্রিম গন্ধ-যুক্ত সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যে সব ক্ষতিকারক রাসায়নিক এতে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হল প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, বেঞ্জিল অ্যসিটেট, স্যিনামিল ফরমেট, পটাসিয়াম ক্রোমেট, সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট ইত্যাদি। এইসব কেমিক্যালের প্রভাবে মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রণ্টাল কর্টেক্স-এ অ্যসিটাইল কোলিন, ডোপামিন ও সেরোটোনিন-এর বিপাকীয় গোলযোগ দেখা দেয়। যার ফলে সাইক্লিক অ্যডেনোসিন মোনোফসফেট (CAMP) -এর সাথে ডোপামিন রিসেপটর-এর নেতিবাতক বিক্রিয়া ঘটে। পরিণামে দেখা দেয় এ.ডি.এইচ.ডি.-র বিবিধ লক্ষণ।

৪. **মোনো-সোডিয়াম গ্লুটামেট (Monosodium Glutamate- MSG)** – আমাদের খাদ্যতালিকায় থাকা ফ্রোজেন ডিনার, স্যলাড ড্রেসিং, স্ন্যকস, চিপস্, ফ্রোজেন মিট, মেয়োনিজ, ফ্রুট সস্, চাইনিজ খাবার, জ্যাম-জেলি, মোরব্বা, স্কোয়াশ ইত্যাদিতে থাকে এই মোনো-সোডিয়াম গ্লুটামেট নামক লবণ। এর অতিরিক্ত ব্যবহারে ব্রেণ ড্যামেজ, ডি.এন.এ ড্যামেজ ও মেণ্টাল কনফিউশন দেখা দিতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে হতে পারে নিউরো-ট্রান্সমিটার-এর গোলযোগে। ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপটরগুলো অকেজো হয়ে গিয়ে দেখা দেয় বহুবিধ লার্নিং ডিসএবিলিটি-র সমস্যা।

৫. **কৃত্তিম রঙ (Artificial Colours)** – নিষিদ্ধ ফুড-কালার যেমন, মেটানিল ইয়েলো, অ্যারামিন, লেড ক্রোমেট, রোডামিন-বি ইত্যাদি ছাড়াও খাদ্যে ব্যবহৃত সরকার অনুমোদিত অনেক কৃত্রিম রঙের মাত্রাছাড়া ব্যবহারে ছোটদের স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষতি হতে পারে। দেখা দিতে পারে শিশুদের হাইপার-অ্যাক্টিভিটি, হাইপার-সেন্সিটিভিটি ও অন্যান্য আচরণগত সমস্যা।

ক) **ব্রিলিঅ্যাণ্ট ব্লু** – বেকড্ গুডস্, বেভারেজ, ক্যাণ্ডি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

খ) **সাইট্রাস রেড** – জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, স্কোয়াশ প্রভৃতিতে মেশানো হয়।

গ) **ইণ্ডিগো কারমাইন** – রঙীন সরবৎ, ক্যাণ্ডি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) **ফাস্ট-গ্রীণ** – আইসক্রিম, ক্যাণ্ডি, বেভারেজ প্রভৃতিতে মেশানো হয়।

ঙ) **এরিথ্রোসিন** – পিৎজা, ফ্রোজেন ফ্রুট, কেচাপ, জ্যাম, জেলি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

চ) **অ্যালুরা রেড** – হেলথ ড্রিঙ্কস, স্পোর্টস ড্রিঙ্কস, ফ্রুট ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম প্রভৃতিতে মেশানো হয়।

ছ) **টারট্রাজিন** – পাস্তা, মাফিন, প্যাসট্রি, ম্যাকারনী, সুগারি স ড্রিঙ্কস, চিজ, বানস্ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

জ) **সানসেট ইয়েলো** – ফ্রুট সস্, কেচাপ, পটাটো চিপস্, বিস্কুট প্রভৃতিতে মেশানো হয়।

এসব অনুমোদিত কৃত্রিম রঙের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল হিসাবে ছোটদের মস্তিস্কে গামা-অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড (GABA) নামক নিউরো-ট্রান্সমিটারের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। যার ফলে অ্যামাইগডালার গ্লুটামেটার্জিক নিউরো-কেমিস্ট্রির গোলযোগ-জনিত কারণে এ.ডি.এইচ.ডি.ও ইনফ্যাণ্টাইল অটিজম-এর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকট হয়।

৬. **টেক্সচার বৃদ্ধিকারী উপাদান (Texture Enhancing Chemicals)** – শিশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত গুঁড়ো দুধ, চিজ, মোরব্বা, আচার, আমসত্ত্ব, মার্জারিন, জেলি, জ্যাম, মাফিন, চকোলেট, ক্যাডবেরি ইত্যাদিতে খাবারের গঠন-কাঠিণ্য বজায় রাখার জন্যে ডাই-সোডিয়াম অর্থো-সালফেট ও মোনো-গ্লিসারাইড সোডিয়াম অ্যালগিনেট পেকটিন যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। বেশীমাত্রায় এসব রাসায়নিক মেশানোর ফলে ব্রেণ-এর অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। বিশেষ করে মস্তিষ্কের বিপাকক্রিয়ায় কিন্যুরেণিক অ্যাসিড-এর কার্যক্ষমতা বিপর্যস্ত হলে দেখা দিতে পারে অর্গ্যানিক অ্যামনেসিয়া ও অ্যাকোয়ার্ড ডিসলেক্সিয়া-র মতো মেমোরি সংক্রান্ত সমস্যা।

৭. **হাই-ফ্রুকটোজ কর্ণ সিরাপ (High Fructose Corn Syrup - HFCS)** – ডায়েট সোডা, জুস ককটেল, ব্রেকফাস্ট, সিরিয়াল, ইয়োগার্ট, স্যালাড ড্রেসিং, ক্যাণ্ডিবার, ফ্রোজেন পিৎজা ইত্যাদিতে এই বিষাক্ত ক্ষতিকারক কর্ণ সিরাপ ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের খাবার বাচ্চাদের অনেকদিন ধরে খাওয়ালে ওবেসিটি ও টাইপ-ট্যু ডায়াবেটিস-এর পাশাপাশি মানসিক অবসাদ, লেখাপড়ায় মনঃসংযোগের অভাব, স্মৃতি-সমস্যা ইত্যাদি হতে পারে।

৮. **কৃত্রিম সংরক্ষণ দ্রব্য (Artificial Preservatives)** – তৃষ্ণা নিবারণকারী নরম পানীয়, ফ্রুট জুস, স্যালাড ড্রেসিং, ম্যাগি, পাস্তা, পীনাট বাটার, বলতে গেলে এককথায় প্রায় সব ধরণের প্রসেসড্ ফুড-এ কৃত্রিম সংরক্ষণ দ্রব্য হিসাবে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক মেশানো হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট, পটাসিয়াম সর্বেট, মিথাইল-প্যারাবেন, সোডিয়াম বাই-সালফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ডাই-মিথাইল ডাই-কার্বোনেট, ক্যলসিয়াম প্রোপিওনেট ইত্যাদি। এসব উপাদানের বিষক্রিয়ায় শিশুমস্তিষ্কে গ্যালানিন নামক নিউরো-পেপটাইড-এর সরবরাহ হ্রাস পায়। তখন দেখা দেয় শৈশবে অতি-চঞ্চলতার সমস্যা। এছাড়া, রেডি-মিক্স স্যুপ, চিউয়িংগাম, ফ্রেঞ্চফ্রাই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সিঅ্যানিসোল (BHA) ও বিউটাইলেটেড হাইড্রো-জাইটোলিউয়েন্স (BHT) - এর ক্ষতিকর প্রভাবে ছোটদের মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাসে অলিগোডেনড্রাইট সেল-এর সংখ্যা অতিরিক্ত কমে যায়। যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় এ.ডি.এইচ.ডি.-র মত অস্বাভাবিক আচরণজনিত সমস্যা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড-এ হোমো-ভ্যানিলিক অ্যাসিড-এর মাত্রাবৃদ্ধির কারণে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) -এর প্রধান প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়।

● **এইসব ক্ষতিকারক খাবারগুলোর পরিবর্তে ছোটদের আমরা কি ধরনের খাবার খাওয়াতে পারি?**

●● কৃত্রিম রঙ-গন্ধ-সুগার-প্রিজার্ভেটিভ মেশানো লোভনীয় জিভে জল আনা খাবারগুলো ছোটদের খাদ্যতালিকা থেকে সম্পূর্ণ বাতিল করুন। বাচ্চাদের খেতে দিন প্রাকৃতিক গুণসমৃদ্ধ টাটকা খাবার-দাবার। যেমন –

১. সুগারি সফট ড্রিঙ্কস-এর অতিরিক্ত সুগার থেকে শরীরে ইনসুলিন রেজিসট্যান্স তৈরী হয়, যা থেকে বাচ্চাদের ফ্যাটি লিভার, টাইপ-টু ডায়াবেটিস ও ওবেসিটি হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এ সবের পরিবর্তে বাচ্চাকে লবণ-চিনি মেশানো লেবুজল খাওয়ান।

২. বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় জাঙ্ক ফুড হচ্ছে পিৎজা,যা নানান অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরী হয়। পরিবর্তে হোলসাম ইনগ্রেডিয়েণ্টস্ দিয়ে হোম-মেড পিৎসা বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন।

৩. হোয়াইট ব্রেড-এ গ্লুটেন নামক প্রোটিন থাকে, যা পেটের রোগে ভোগা বাচ্চাদের জন্যে মারাত্মক খারাপ। প্যাকেটের

গায়ে গ্লুটেন-ফ্রি লেখা দেখে তবেই রুটি কিনুন। না হলে হাতে বানানো গমের আটার রুটি খেতে দিন।

৪. প্রায় সব ধরনের ফ্রুট-জুস আসলে ফলের কৃত্রিম গন্ধ-যুক্ত চিনি-জল। এ সবের পরিবর্তে পমগ্রেনেড জুস, ব্লু-বেরি জুস, আমলকি জুস খাওয়ান।

৫. সোয়াবিন অয়েল, কর্ণ অয়েল, কটন-সীড অয়েল, ক্যানোলা অয়েল ইত্যাদি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ভেজিটেবল অয়েল মানবদেহে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়িয়ে দেয় – যার ফলে এ.ডি.এইচ.ডি.-র হাইপার-অ্যাক্টিভিটি ছাড়াও ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এ সবের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট-সমৃদ্ধ কোকোনাট অয়েল, ভার্জিন অলিভ অয়েল, অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়াতে পারেন।

৬. বাটার-এর বিকল্প হিসাবে যে মার্জারিন খাওয়া হয়, তা স্বাস্থ্যের জন্যে মোটেও ভালো নয়। খেতে হলে বাটার খান, মার্জারিন নয়।

৭. পেস্ট্রি, ক্যুকিজ, কেক বাচ্চাকে খাওয়াবেন না। পারলে বাড়ীতে বানিয়ে কেক খাওয়ান।

৮. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও পটাটো চিপস্ খাওয়াবেন না। ভেজে খাবার থেকে আলু সেদ্ধ করে খাওয়া ভালো। মুচমুচে করে ভেজে খেতে হলে, বেবি-ক্যারট বা নাট ভেজে খান।

৯. লো- ফ্যাট ইয়োগার্ট বাচ্চাকে দেবেন না। পরিবর্তে অ্যাক্টিভ প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ ফুল- ফ্যাট ইয়োগার্ট খেতে দিন।

১০. বাজারের রঙীন আইসক্রিম ছোটদের খেতে দেবেন না। স্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে বাড়ীতে বানানো আইসক্রিম খাওয়াতে পারেন।

১১. প্রসেসড মিট, এগ ও ফিশ প্রোডাক্ট কিনবেন না। পরিবর্তে মরশুমি ও জ্যান্ত মাছ, টাটকা মাংস, দেশী মুরগির ডিম খাওয়া ভালো।

১২. খাবারের প্যাকেটের গায়ে মোনো-সোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG), সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট, ডাই-মিথাইল ডাইকার্বোনেট লেখা থাকলে তা বাচ্চাকে একদম খাওয়াবেন না।

এছাড়া শিশুদের জন্যে ক্ষতিকর স্পিনাচ পাস্তা, ন্যুডলস্, টার্কি স্যাণ্ডউইচ, বার্গার, প্রসেসড চীজ, ফ্রুট ককটেল, ফ্লেভারড সোয়া-মিল্ক, চিকেন র‍্যাপ, ম্যাকারণী, ডায়েট সোডা ইত্যাদি বাচ্চাকে না খাওয়ানোই ভালো। পরিবর্তে ভালো তেলে ভাজা লুচি, পরোটা, অঙ্কুরিত ছোলা, অ্যাণ্টি-অক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ টাটকা মরশুমি ফল, ছানা, খাঁটি দুধ দিয়ে বাড়ীতে বানানো পায়েস-সুজি ইত্যাদি খাওয়াতে পারেন। এককথায়, ভেজাল খাবার থেকে সদা সতর্ক থাকুন।

● ছোটদের এ.ডি.এইচ.ডি., অটিজম ও লার্নিং ডিসএবিলিটি-র চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

●● হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিজ্ঞানে ছোটদের এই তিনটি রোগের সুফলদায়ক চিকিৎসা আছে। রোগের লক্ষণসমূহ বিশ্লেষণ করে এ.ডি.এইচ.ডি. স্ক্রীনিং টেস্ট, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার টেস্ট, ডিসলেক্সিয়া এপিসোড টেস্ট, মেমোরি স্ক্রীনিং টেস্ট, লার্নিং ডিসএবিলিটি টেস্ট ইত্যাদির সাহয্যে নির্দিষ্টভাবে রোগ-নির্ণয় করা হয়। তখন কনস্টিটিউশনাল সাইক্রিয়াটিক হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ ও মেটিরিয়াল ডোজ থেরাপিউটিক মেডিকেশন-এর সাহায্যে চিকিৎসা শুরু করা হয়। এছাড়া মাইক্রো-ডোজ ক্ল্যাসিক্যাল মেডিসিন-এর সাহায্যে ফলপ্রসূ চিকিৎসা আধুনিক হোমিওবিজ্ঞানের প্রমাণিত সাফল্য। সঙ্গে নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিকারে বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থেরাপী, সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপী, ক্রাইসিস ইণ্টারভেনশন এণ্ড ইনস্ট্রুমেণ্টাল কণ্ডিশনিং, রেসিপ্রোকাল ইনহিবিশন টেকনিক-এর অধীনে মুড ও কন্ডাক্ট মডিফিকেশন থেরাপী চালিয়ে যেতে হবে।

সবশেষে বলি, আমাদের প্রতিশ্রুতিবান ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হলে সর্বস্তরের অভিভাবগকগণকে ভেজাল খাবারের বিষ-এর (সুধী নাগরিক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে) বিরুদ্ধে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের লাগামছাড়া অর্থলোভের যাঁতাকলে শিশুস্বাস্থ্য আজ ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে।

Chapter -- 18

মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ কারণ ও প্রতিকার

জড়বুদ্ধি কোনো একটা নির্দিষ্ট রোগ নয়, এটি একটি উপসর্গ মাত্র। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তি তার দৈহিক বয়সের অনুপাতে বাড়েনি এবং যারা সমবয়স্কদের সাথে সহজে মিলেমিশে চলতে পারে না, তাদেরকেই সচরাচর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বলা হয়। এদের আই-কিউ (Intelligence Quotient) — সাধারণত ৮০-৯০ এর নীচে হয়ে থাকে।

(ক) মানসিক প্রতিবন্ধকতা কিভাবে চিনবেন ও শ্রেণি বিভাজন — অল্প জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা নিজের বয়সী অন্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় মানসিক বুদ্ধিতে তিন-চার বছর পিছিয়ে থাকে। ধৈর্য্য ধরে একই জিনিস বারবার শেখালে তবেই এরা তা আয়ত্ব করতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে স্কুলে এরা চতুর্থ থেকে সপ্তম শ্রেণির বেশি এগোতে পারে না। এদের আই-কিউ বড়োজোর ৫৫ থেকে ৭০ পর্যন্ত হতে পারে। মাঝারি জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারে না, কেননা এদের আই-কিউ ৩৫ থেকে ৫৫-র বেশি হয় না। আর যারা গুরুতর জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৫-এর কম হয়ে থাকে। এরা এমনকি নিজেরা নিজেদের সাধারণ কাজকর্ম গুছিয়ে করতে পারে না।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুদের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

Idiot বা জড়ধী — এদের I.Q. হয় ০ থেকে ২০

Imbecile বা মন্দধী — এদের হয় I.Q. ২০ থেকে ৪৫

Moron বা ক্ষীণধী — এদের I.Q. হয় ৪৫ থেকে ৭০

Feeble-minded Dull বা অল্পধী — এদের I.Q. হয় ৭০ থেকে ৯০

(খ) মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ —

১. ডাউন সিনড্রোম যা বংশগত কারণে ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্যে হয়ে থাকে।

২. লিঙ্গ পরিচায়ক ক্রোমোজোমের বিকৃতির জন্যে উদ্ভুত টার্নার'স সিনড্রোম ও ক্লিনফেল্টারস্ সিনড্রোম-এর জন্যে সন্তান জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন হতে পারে।

৩. মস্তিষ্কের গঠনগত বিকৃতি বা ত্রুটি থেকে শিশু জড়বুদ্ধি হতে পারে।

৪. গর্ভবতী মায়ের রুবেলা বা সিফিলিস ভাইরাস -এর ইনফেকশন হয়ে থাকলে ভুমিষ্ঠ সন্তান জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. জন্মের সময়ে কোনো কারণে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে বা ফরসেপ ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ফলে, আপনার সন্তান জড়বুদ্ধি হতে পারে।

৬. সন্তান গর্ভাবস্থায় মা যদি চিকেন পকস্ বা মিজিলস্ -এ ভোগে, তবে ভূমিষ্ঠ শিশু নিম্নমানের বুদ্ধি নিয়ে জন্মাতে পারে।

৭. প্রি-ম্যাচিওর ডেলিভারী-র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রসব হওয়া বাচ্চা নিম্নবুদ্ধির হতে পারে।

৮. সন্তান প্রসবের সময় দীর্ঘকালীন হলে অকসিজেন-এর অভাব-জনিত কারণে সে জড়বুদ্ধির হতে পারে।

৯. সন্তান জন্মের কিছুদিনের মধ্যে যদি বাচ্চার এনসেফালাইটিস বা এপিলেপ্সি হয়ে থাকে, তবে সন্তানের বুদ্ধির বিকাশ প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১০. শৈশবকালীন মেনিনজাইটিস-এ শিশু বুদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে।

১১. শৈশবাবস্থায় অতিরিক্ত হুপিং কাশি-এর সংক্রমণের ফলে শিশুর মস্তিষ্কে রক্তপাত হতে পারে, যার থেকে পরবর্তীতে শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১২. মাইক্রোসেফালি বা ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কের শিশুরা বুদ্ধির দিক থেকে অপরিণত হয়।

১৩. পোরেনসেফালি থাকলে অচীরে মস্তিষ্কের ঘিলু শুকিয়ে যায়, যার ফলে শিশু জড়ধী-সম্পন্ন হয়ে পড়ে।

১৪. মস্তিষ্ক অভ্যন্তরে জল জমার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্ভুত হাইড্রোসেফালাস-এর জন্যে সন্তান জড়বুদ্ধির হয়।

১৫. অকসিসেফালি-র ক্ষেত্রে মাথার চূড়াটা উঁচু হয়ে ওঠে আর বাচ্চা হয় কিছুটা অল্পধী-সম্পন্ন।

১৬. গর্ভাবস্থায় মায়ের জরায়ুর উপর আঘাত বা তাতে অতিরিক্ত রেডিয়েশন-র ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তান মন্দধী হতে পারে।

১৭. রেসাস ইনকমপ্যাটিবিলিটি-র জন্য মায়ের রক্তে আর-এইচ ফ্যাকটর-এ অসংগতি থাকে। তেমন মায়ের সন্তানের বুদ্ধি অতি নিম্নমানের হয়।

১৮. মেটাবলিক ডিসঅর্ডার-এর জন্য সৃষ্ট সেরিব্রাল লিপয়ডসিস বা গ্যালকটোসুরিয়া-র প্রভাবে শিশু ক্রমান্বয়ে জড়বুদ্ধিতে পরিণত হয়।

১৯. ব্রেণ ম্যাটার-এ নার্ভাস সিস্টেম-এর জন্মগত বিকৃত অবস্থানের জন্যে সৃষ্ট সেরিব্রাল ডাইপ্লেজিয়া বা স্প্যাসটিক ডাইপ্লেজিয়া-র জন্য সন্তান অল্পবুদ্ধির হতে পারে।

২০. পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড-র বিকৃতির জন্যে সৃষ্ট ডাইসট্রোফিয়া অ্যাডিপোসোজেনিট্যালিয়া -র প্রভাবে সন্তানের শরীরে মেদাধিক্য দেখা দেয়, তার যৌনাঙ্গ অপরিণত থাকে এবং এদের বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় কম হয়।

২১. অশুভ পারিবারিক পরিবেশে শিশু দারিদ্র, অবহেলা, নির্দয় ব্যবহার, স্নেহ-ভালেবাসাহীন জীবন কাটায়। আর তার সাথে যদি সেই শিশু উপযুক্ত সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার বুদ্ধির বিকাশ যারপরনাই ব্যহত হয়।

(গ) ম্যানেজমেণ্ট অফ মেণ্টাল রিটার্ডেশন

১. শিশু নির্দেশক কেন্দ্র বা Child Guidance Clinic-এর ব্যবস্থাপনায় কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর যোগ্য সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

২. স্পেশাল এডুকেশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. খেলাভিত্তিক চিকিৎসা বা Play Therapy-র সাহায্যে নাচ, ড্রয়িং ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে।

৪. অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ বা অনুপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ থেকে বাইরে এনে শিশুকে যথোপোযুক্ত পরিমণ্ডলে রাখতে হবে, যেখানে তার মননশীলতার চর্চা করার সুযোগ অবারিত থাকবে।

৫. জড়বুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শারীরিক রোগের সুচিকিৎসার জন্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ও সহায়তা নিতে হবে।

(ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের আমরা চিনতে পারি না কেন?

১. স্কিজোফ্রেনিফর্ম ডিসঅর্ডার -এ দীর্ঘকাল আক্রান্ত থাকলে কৈশোর বয়সী ছাত্রদের জড়বুদ্ধির সাথে পৃথক করা সমস্যা হয়।

২. টিউবারকিউলোসিস, পোলিওমাইলাইটিস, ম্যালনিউট্রিশন ইত্যাদি দীর্ঘকালীন দেহজ রোগে যে সকল শিশুরা ভুগছে, তাদের ঠিকমত শিখনের সমস্যার জন্যে জড়ধী সম্পন্ন বলে ভ্রম হয়।

৩. সোশ্যাল আইসোলেশন বা অজ্ঞতার পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুদের আপাতদৃষ্টিতে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ভুল হয়। সঠিক দৈহিক ও মানসিক পরিবেশে এদের বিকশিত হবার সুযোগ দিলে, এরা স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

৪. যারা অন্ধ বা কালা, তাদেরকে আমরা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলে ভুল করি। তাদের এইসব শারিরীক ত্রুটির সাথে জড়বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই।

(ঙ) মানসিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতনতা

১. পরিবারের লোকজনদের এদের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলার মনোভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

২. কর্মস্থানের ব্যাপারে এদের সীমিত ক্ষমতা ও দক্ষতা বুঝেশুনে তদুপোযোগী কাজের ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. মেণ্টাল স্যানাটোরিয়াম (Mental sanatorium)-এ না রেখে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের তাদের পরিবার-পরিজনের সংস্পর্শে রাখার বন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

৪. জড়বুদ্ধিদের উন্নতির ব্যাপারে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা করা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রতিবেশীদের অন্য সক্ষম সন্তান-সন্ততিদের সাথে তুলনা করে এদের হেয় প্রতিপন্ন করা উচিৎ নয়।

৫. এদের মানসিক অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে স্নেহ ও প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে যতটা সম্ভব শেখানোর প্রয়াস করতে হবে।

৬. আস্তে-ধীরে, ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে অসীম ধৈর্য্য সহকারে প্লে-থেরাপি-র সাহায্যে এদের শেখানোর উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি, জড়ধী-সম্পন্ন শিশুর সঙ্গে একই কাজ বড়রা করলে অনুকরণ করে সে অনেকটা শিখে নিতে পারবে।

৭. জড়বুদ্ধির মান অনুযায়ী বাস্তব সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে এদের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে। সবশেষে বলি, এদের মানসিক সমস্যার সাথে একাত্ম হয়ে, সমমর্মীতা দেখিয়ে তাদের সীমিত ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে তাদের ভালোর জন্য ভাবলে ও করলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

(চ) মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রতিকার

১. জড়বুদ্ধির সম্পর্কে সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট উদার ও মানবিক হতে হবে।

২. গর্ভবতী মায়ের জেসটেশন পিরিয়ড-এ যে সকল কারণে জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুর জন্ম হয় তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সন্তান প্রসবের সময় যে সকল কারণে শিশু মন্দধী হয়, তাঁর প্রতিরোধে সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি ও ভূমিষ্ঠ সন্তানের ব্যালেন্সড ডায়েট -এর দিকে যথাযথ নজর দিতে হবে।

৫. সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ ও উপযুক্ত সামাজিক পরিমণ্ডলে শিশুর লালন-পালন করতে হবে।

Chapter -- 19

ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সমস্যা ও প্রতিকার

(ক) স্কিজো-অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার (Schizo-affective Disorder) – এই ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, খেলাধূলায় তার আর মন বসে না, সবসময় সে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। এদের কেউ কেউ অল্পেই বিরক্ত হয়ে পড়ে, সারাদিন দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে আর এদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। রোগীর কাজকর্ম ও আবেগ প্রকাশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে সে বেশিরভাগ সময় নিজেকে কল্পনার জালে জড়িয়ে রাখে। লক্ষণ প্রকট হওয়া মাত্রই এদের সাইকিয়াট্রিস্ট-র কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। থেরাপি বাই পজিটিভ রিইনফোর্সমেণ্ট পদ্ধতিও ক্ষেত্রবিশেষে কার্যকরী হয়।

(খ) স্কুল ফোবিয়া (School Phobia) – স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমত না পারলে, বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করার আশঙ্কা হলে, স্কুলে শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়ার ভীতি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে চায় না। তাকে নিয়ে স্কুলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার পরদিন থেকে বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না। ডিপ্রেসিভ মুড সিনড্রোম -এ আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ফোবিয়া-তে ভোগে। স্কুলভীতি কাটানোর জন্যে স্কুলের পরিবেশে দেখতে হবে, যেন ছাত্র-ছাত্রীরা অপমানিত বা নিরাপত্তার অভাব না বোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ ও স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াসে শৈশব ও কৈশোরের স্কুলভীতির প্রতিকার করা যায়।

(গ) এডিএইচ ডি (ADHD or Attention Deficit Hyper-kinetic Disorder) – এরা চঞ্চল প্রকৃতির হয়, অতিশয় অস্থিরমতি ও অকারণে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে। বাড়িতে বা স্কুলে সর্বত্র এদের সম্পর্কে মনঃসংযোগের ব্যাপারে অভিযোগ শোনা যায়। কনসেনট্রেশন ও অ্যাটেনশন-এর সমস্যার জন্যে এদের শিখন-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরা খেয়ালী ও বদমেজাজী প্রকৃতির হয় এবং পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের অবাধ্য হয়। কারুর কারুর অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতাও থাকে। এদের হাইপারকাইনেসিস-এর মূলে শৈশবে মস্তিষ্কে আঘাত, মেনিনজাইটিস বা ক্যোরিয়া -র উপসর্গ থাকতে পারে। এদের চিকিৎসা সাধারণত: কাউন্সেলিং ও সাইকিয়াট্রি- র সাহায্যে হয়ে থাকে।

(ঘ) ক্রিমিন্যাল বিহেভিওর-প্রণ চাইল্ড (Criminal Behaviour-prone Child) – এই ধরণের সমস্যামূলক কিশোর-কিশোরীরা জেদী, বদমেজাজী, নিষ্ঠুর ও স্নেহশূন্য হয়। এদের ক্লেপটোম্যানিয়া বা চুরির বাতিক থাকে। এরা মিথ্যা কথা বলে, এমনকি অল্প বয়সে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অভিভাবকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এদের কারুর কারুর স্কুল পালানোর ঝোঁক দেখা দেয়। এরা সমবয়সীদের প্রতি হিংসা-দ্বেষ পোষণ করে, গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধা-অসৌজন্য প্রকাশ করে। প্রফেসন্যাল সাইকোথেরাপিস্ট -এর সাহায্য নিলে এই ধরনের অপরাধ প্রবণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাব পরিবর্তন করা যায়।

(ঙ) ইনফ্যানটাইল অটিজম্ (Infantile Autism) – শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা ছেলেদের ভিতর বেশি দেখা যায়। এরা কারোর সাথে মিশতে পছন্দ করে না, একা-একা থাকতে পছন্দ করে। এইসব বাচ্চাদের যেমন খেলার জিনিসে আগ্রহ থাকে না, তেমনি খেলাধূলা করার প্রতি ঝোঁকও থাকে না। বাহ্যদৃষ্টিতে এদের জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মনে হলেও, এরা কিন্তু বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পরিণত হয়ে থাকে। এরা কথা বলে কম, আর কেবল নিজের কাজ নিয়ে মশগুল থাকে। পৃথিবীর সবকিছু এদের কাছে সম্পূর্ণ আকর্ষণহীন, প্রক্ষোভ জীবনের দারিদ্র এদের সবকিছুর প্রতি অমনোযোগী করে রাখে। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এদের খুবই অসহ্য লাগে। বিহেভিওর থেরাপি-র সাহায্যে অটিসম-এর বাচ্চাদের অস্বাভাবিক আচার-আচরণগুলোকে অনেকাংশে প্রশমিত করা যায়। বাবা-মায়েরা এমন ধরণের সন্তান থাকলে স্পেশাল এডুকেশন-এর সুবিধাও নিতে পারেন।

(চ) টেমপারামেণ্ট ডিসঅর্ডার (Temperament Disorders) – শৈশবের বদমেজাজ একটি সমস্যামূলক মানসিক বিকার। এই ধরণের শিশুরা প্রচণ্ড রাগী হয়, এদের খামখেয়ালিপনার শেষ থাকে না। এরা যখন যা বায়না করবে তখনই তা না পেলে, হাতের সামনে যা জিনিসপত্র পাবে তা ছিঁড়তে বা ভাঙতে থাকে। নিজের মাথার চুল ছিড়তে শুরু করে, মা-বাবার গায়ে হাত তোলে, কেউ কেউ এমনকি মুখ খারাপও করে বসে। এদের বুদ্ধি যে অপরিণত হয় তা নয়, কিন্তু উত্তেজিত স্বভাবের জন্যে এদের কোনোকিছু শেখানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে, অভিভাবকদের

আচরণের বিকাশকে বিঘ্নিত করতে পারে। প্রফেসন্যাল সাইকোথেরাপিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-র তত্ত্বাবধানে এদের কউন্সেলিং নির্ভর চিকিৎসা খুবই ফলপ্রসূ হয়।

(ছ) ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (Maniac Depressive Psychosis) **—** শৈশব ও কৈশোরের বিষন্নতার সাথে কারুর কারুর আবার খেদোন্মত্ততা দেখা যায়। অনেক শিশুদের মধ্যে ডিপ্রেশনের অ্যাকিউট অ্যাটাক হতেও শোনা যায়। তখন অযথা রাগ, অপরাধপ্রবণতা বা লেখাপড়ায় অমনোযোগ কিংবা দেহের অংশবিশেষে ব্যাথা-যন্ত্রণা, খাবার-দাবারে অনিচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়াল ও ফ্যামিলি সাইকোথেরাপি -র পাশাপাশি অ্যান্টি-ডিপ্রেসিভ ড্রাগ্ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

Chapter -- 20

শৈশবের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিকার

(ক) হাইপারকাইনেসিস সিনড্রোম (Hyperkinesis Syndrome) — আচরণ-সংক্রান্ত এই সমস্যায় শিশুরা সহজে রেগে যায়, বেশিক্ষণ মনোযোগ রেখে লেখাপড়া করতে পারে না, হতাশা সহ্য করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। কারুর কারুর মোটর ও সেন্সরি কো-অর্ডিনেশন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে, অত্যন্ত আবেগ-প্রবণ ও মানসিকভাবে খুবই অস্থিরমতি হয়ে পড়ে। এরা কখনো খুবই ফুরফুরে মেজাজে থাকে, আবার পরমুহূর্তে বদমেজাজী হয়ে পড়ে। ব্রেনের কেমিক্যাল ফাংশন-এর বিকৃতির জন্যে এই সমস্যা হয়। বিহেভিওর ইন্টারভেনশন ও মেডিকেশন-এর সাহায্যে এর প্রতিকার করা যায়।

(খ) খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যা (Eating Disorders) –

১. অ্যানোরেকসিয়া নার্ভোসা (Anorexia Nervosa) **—** খাদ্য-সংক্রান্ত এই রোগ সাধারণত বালিকা ও কিশোরীদের মধ্যে দেখা যায়। ক্ষুধামান্দ্য ও খাবারে রুচির অভাব এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল আলোচনা করে। টিভিতে রান্না শেখানোর অনুষ্ঠান দেখে ও তা নিয়ে ভরপুর চর্চা করে, কিন্তু নিজের খাবার বেলায় খায় খুবই সামান্য। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে এরা কম খায় ও ব্যায়াম করে শরীরের মেদ ঝরানোর চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধির সময়কার শারীরিক পরিবর্তন ও যৌনতার বিকাশ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে কিশোরীরা এই সমস্যার শিকার হয়। ইনস্ট্রুমেন্টাল কণ্ডিশনিং পদ্ধতিতে সাইকোথেরাপি ও ফ্যামিলি কাউন্সেলিং করে এর সমাধান করা হয়।

২. বুলিমিয়া নার্ভোসা (Bulimia Nervosa) **—** এটাও একটি খাদ্য-বিষয়ক সমস্যা। এতে রোগীর জীবনচর্যায় অতিরিক্ত আহার ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকে। রাতে পেট ভরে রাতের খাবার পরেও এরা বাড়ির অন্যেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রীজে রাখা মিষ্টি ফল বা অন্য সুস্বাদু খাবার-দাবার না চিবিয়ে গপগপ করে খেয়ে থাকে। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে ভালো করে চিবিয়েও খায় না। অ্যানোরেকসিয়া নার্ভোসা -র মত এইসব ক্ষেত্রেও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাবার বা মোটা-মেদ হয়ে যাবার ভয় থাকে। ইনডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপি-র সাহায্যে এদের সফল চিকিৎসা হতে পারে। অ্যাভারসন থেরাপি ও এক্ষেত্রে সুফল দেয়।

(গ) অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডার (Anxiety Disorder) **—** যাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ মানের থেকে উচ্চ তারা দুশ্চিন্তা নামক এই নিউরোটিক ডিজিজ-র শিকার হয়। অমূলক ভয় থেকে উত্তেজনা, মৃত্যুভয়, অকারণে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি থেকে এদের হাত-পা কাঁপে, হার্টবীট বৃদ্ধি পায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয় এবং এদের শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয় আর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধারাবাহিক এই ধরণের দুশ্চিন্তা থেকে অনেকের মাথাব্যথা, পড়াশোনায় আগ্রহের অভাব ও মনোযোগের সমস্যা হতে পারে। এরা ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, এমনকি ঘুমের মধ্যেও দুশ্চিন্তার স্বপ্নছবি দ্যাখে, কেউ তাকে লাঠি নিয়ে মারছে বা কেউ তার গলা টিপে ধরছে কিংবা কে বা কারা তার বাড়ির ছাদের উপর থেকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্যে দুশ্চিন্তার সম্ভাব্য কারণগুলো নির্ণয় করে রোগীকে অনেকাংশে মুক্তি দেওয়া যায়।

(ঘ) স্লিপ অর্ডারস (Sleep Disorders) –

১. হাইপারসোমনিয়া (Hypersomnia) **–** ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের অতিরিক্ত ঘুমের অভ্যাস দেখা যায়। কেউ কেউ ১০-১২ ঘণ্টার বেশিও ঘুমায় বা সকালে অনেক বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমায়।

২. ইনসমনিয়া (Insomnia) **–** এরা রাতে শুয়ে বিছানায় ছটফট করে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। স্বল্পস্থায়ী ঘুমের জন্যে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ক্লান্তি অনুভব করে।

৩. নার্কোলেপ্সি (Narcolepsy) **–** যখন-তখন দিনেরবেলায় ঘুমানোর এটি একটি খারাপ অভ্যাস। এরা ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দ্যাখে যাকে সাইকিয়াট্রির ভাষায় বলা হয় হিপনোগগিক হ্যালুসিনেশন।

৪. স্লিপ টেরর ডিসঅর্ডার (Sleep Terror Disorder) **–** এটি একটি ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ ও দুঃস্বপ্ন-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার সমস্যা। ছেলে-মেয়েরা মাঝপথে ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

৫. ঘুমের মধ্যে হাঁটা (Somnambulism or Sleep Walking) **–** ঘুমের ঘোরে উঠে ঘরের মধ্যে হেঁটেচলে বেড়ায়, একঘর থেকে অন্য ঘরে চলে যায়, এমনকি বাড়ির বাইরেও বেরিয়ে যেতে শোনা যায়।

৬. স্লিপ অ্যাপনিয়া (Sleep Apnea) **–** শ্বাস-সংক্রান্ত এই সমস্যা ঘুমানো অবস্থায় হয়ে থাকে। মোটাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার পাশাপাশি শ্বাসকার্যের ব্যাঘাতও পরিলক্ষিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম -এ ঘুমের মধ্যে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(ঙ) ফোবিয়া (Simple and Symbolic Concrete/Abstract Phobias) **–** কেউ কেউ নিছক কোনো বস্তুকে ভয় পায়। কেউ কেউ দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ বা পরাজয়ের গ্লানি থেকে নানা ধরণের ফোবিয়ার শিকার হয়। অনেকে আবার টিভির পর্দায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের বিভৎস দৃশ্য দেখে প্রতীক রূপে বারুদে ভয় পায়, গুলিবিদ্ধ মানুষের আর্তচিৎকার শুনে ও দেখে বন্দুকের ভয় পায়। মৃত্যু ভয় (Thanatophobia) সব বয়সের মানুষের একটি সাধারণ ভয়। অনেকে আবার রক্ত দেখলে (Hematophobia) ভয় পায়, অনেকে উঁচুস্থানের (Acrophobia) ভয় পায়, কেউ কেউ আবার বিশালদেহী জীবজন্তু দেখে (Zoophobia) ভয় পায়, ইত্যাদি।

(চ) ডিসরাপটিভ বিহেভিওর ডিসফাংশন (Disruptive Behaviour Dysfunction) – এরা অযথা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের উত্তেজিত করে, বদমেজাজী হয়, বড়দের সঙ্গে তর্ক করে বা বয়োজেষ্ঠ্যদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে। নিজের অশ্লীল ব্যবহারের জন্যে এরা অন্যদের দোষারোপ করে, হামেশাই এরা নেতিবাচকভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই ধরনের অপজিশন্যাল ডিফাইঅ্যান্ট ডিসঅর্ডার-এর প্রতিকার করতে হলে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে মুড ডিসঅর্ডার-এর চিকিৎসা করতে হবে। সিস্টেম্যাটিক ডিসেনসিটাইজেশন (Systematic Desensitization) এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল দেয়।

(ছ) জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্সি (Juvenile Delinquency) – এরা মিথ্যাভাষণে পটু হয়, গুরুজনদের অবাধ্য হয়ে থাকে। অন্যদের অধিকারগুলোকে এরা হেলায় অবজ্ঞা করতে ভালোবাসে, যখন-তখন মেজাজ হারিয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে অপ্রস্তুত অবস্থার সৃষ্টি করে বসে। এদের চুরির বাতিক (Kleptomania) থাকে, প্রায়ই আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলে। অনেকেই এরা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে ও যৌন আগ্রাসনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন -এর সাহায্যে এই ধরণের কন্ডাকট ডিসঅর্ডার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রেসিপ্রোক্যাল ইনহিবিশন টেকনিক (Receprocal Inhibition Technique) এ ক্ষেত্রে ফলদায়ক।

Chapter -- 21

কৈশোরের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিকার

(ক) ওসিপিডি (Obsessive Compulsive Personality Disorder) **—** অনিয়ন্ত্রিত অবাস্তব বদ্ধমূল ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা সমস্ত কাজকর্ম নিখুঁতভাবে করার প্রয়াস করে। মনোভঙ্গী খুঁতখুতে হবার জন্যে তুচ্ছ বিষয়ে অযথা সময় অপচয় করে, কোনো কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারে না। সময়ানুবর্তিতার প্রতি দৃঢ়তা দেখাতে গিয়ে এরা ব্যবহারিক জীবনে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না। পরীক্ষার হলে কম নম্বরের প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে গিয়ে, ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় কুলিয়ে উঠতে পারে না। এরা জীবন যাপনে অন্তর্মুখী, সংশয়বাদী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে একসপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি ও নন-ডাইরেকটিভ কাউন্সেলিং পদ্ধতি প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

(খ) হিস্ট্রিওনিক পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Hysterionic Personality Disorder) — এই ধরনের ব্যক্তিত্বের লোকজন অপরের প্রশংসা পাবার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণীয় হাবভাব-সম্বলিত আচরণ প্রকাশ করে। নিজের মধ্যেকার নিরাপত্তাহীনতার অভাব ও আনুষঙ্গিক দুর্বলতা ঢাকার জন্যে ছলনার আশ্রয় নেয়। এরা অন্য লোকের আশ্রিত হয়ে থাকতে পছন্দ করে কারণ এরা নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। সম্মোহনী আচার-আচরণের পাশাপাশি অগভীর আবেগ, দ্রুত পরিবর্তনশীল অদ্ভুত মেজাজ ও চমকপ্রদ প্রলুব্ধকারী ব্যবহার এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে ক্যারেকটর অ্যানালিসিস করে সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

(গ) প্যারানয়েড পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Paranoid Personality Disorder) **—** প্যারানইয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিত্ব-রা সবসময় মনে করে অন্যেরা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বা তার বিষয়ে অশ্লীলভাবে বলা-কওয়া করছে। এরা এতটাই সন্দেহপ্রবণ হয় যে, ভাবে কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে অথবা অন্যে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। এরা সর্বদা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় আর তিলকে তাল করে অনর্থক ঝগড়াঝাঁটি বাধায়। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে সেকশনাল সাইকো অ্যানালিসিস আর ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

(ঘ) অ্যান্টিসোশ্যাল পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Antisocial Personality Disorder) **—** এরা অল্প বয়স থেকেই অসদুপায় অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়, সামাজিক নিয়মকানুন উপেক্ষা করার প্রবণতা সম্পন্ন হয় এবং সুবিধাবাদী আর বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতির হয়। অপরাধপ্রবণতার পাশাপাশি এরা ঝগড়াটে, উগ্র স্বভাবের ও বেপরোয়া নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। মাদকাশক্তি ও যৌন সম্ভোগের প্রতি অতিশয় ইচ্ছা এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে নার্কো অ্যানালিসিস ও সাইকোথেরাপি-তে কিছুমাত্রায় সুফল আশা করা যায়।

(ঙ) অ্যানসাস পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Anxious Personality Disorder) **—** মনের দিক থেকে এরা খুব অস্থির, ভীত-আশঙ্কিত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ প্রকৃতির হয়ে থাকে। সর্বদা এরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটায় ও বিপদের সম্ভাবনাকে অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে দেখতে পছন্দ করে। অতি সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয়েও তার নার্ভাসনেস কাজ করে বা অতিরিক্ত উৎকণ্ঠিত দেখায়। বিপদের কালো মেঘ তার মনের আকাশে ছেয়ে থাকে। ভাবে, সে হয়তো পাগল হয়ে যাবে। অনর্থক দুশ্চিন্তার ভারে সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে একসপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি পদ্ধতি প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। সম্প্রতিকালে অনেকেই অ্যাডজাংকটিভ বিহেভিওর‍্যাল টেকনিক -এর অধীনে বায়োফিডব্যাক ও পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে সমস্যা নিরাময়ে সাফল্য পাওয়ার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন।

(চ) স্কিজয়েড পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Schizoid Personality Disorder) **—** এরা প্রায় সবাই কল্পনার জালে নিজেদের বন্দী করে রাখে। অন্যদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে যারপরনাই অনীহা। প্রশংসা বা সমালোচনা এরা উদাসীনভাবে গ্রহণ করে। এরা আত্মকেন্দ্রিক, রসবোধহীন আর অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়তে অপরাগ হয়ে থাকে। এই ধরনের চিত্তভ্রংশী বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিত্ব প্রধানত: তিন রকমের হয়ে থাকে।

১. ডাইসথাইমিক পার্সোন্যালিটি (Dysthymic Personality) **—** দুশ্চিন্তা সর্বদা এদের পিছু তাড়া করে। এরা হতাশাগ্রস্থ, বিমর্ষ আর অত্যন্ত নিরাশাবাদী প্রকৃতির হয়। আগামী দিনের সম্ভাব্য কাল্পনিক দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে পাগল হয়ে ওঠে। জীবনকে উপভোগের মর্ম এরা বুঝতে পারে না, বরং উলটে জীবনের প্রতি অনীহা পোষণ করে।

২. হাইপারথাইমিক পার্সোন্যালিটি (Hyperthymic Personality) **—** এরা বেশি চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না, হুটহাট জীবনের দরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। কিন্তু নিজের আশানুরূপ সাফল্য না পেলে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায়। এদের অনেকে অবশ্য খুবই আশাব্যঞ্জক মননের হয়, হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে আর জীবনকে উপভোগ করারও চেষ্টা করে।

৩. সাইক্লোথাইমিক পার্সোন্যালিটি (Cyclothymic Personality) — এই ধরণের আবেগে বিকারগ্রস্থ ছেলে-মেয়েরা কিছুদিন খুব আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায়, কিছুদিন মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে দিন অতিবাহিত করে আর কিছুদিন অন্তর আবার দুশ্চিন্তায় ও বিষাদে ডুবে যায়। আবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের বিকারে পর্যায়ক্রমে এই তিন ধরণের মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়।

স্কিজয়েড পার্সোন্যালিটি-র লোকেরা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডলে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজগুলি মোটামুটি ঠিকঠাক করতে পারে। যদিও আন্তরিকতাহীন ব্যবহারের জন্য এরা সমাজের লোকজনের সঙ্গে সাবলীলভাবে মেলামেশা করতে পারে না। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে কাউন্সেলিং ও গ্রুপ সাইকোথেরাপি সুফলদায়ক। ডিসঅর্ডার যদি স্কিজোফ্রেনিয়া-র দিকে ঝোঁকে তখন অনেক সাইকিয়াট্রিস্ট, কেমিক্যাল শক বা ইনসুলিন কোমা থেরাপি-র কথা ভাবেন।

(ছ) নার্সিসিসটিক পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Narcissistic Personality Disorder) — এরা নিজের বিরুদ্ধে সমালোচনা সহজে হজম করতে পারে না। সবসময় এরা প্রসংশা ও স্বীকৃতি লাভের জন্যে লালায়িত হয়। অন্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীও এরা খোলামনে গ্রহণ করতে পারে না। অহেতুক নিজেকে এরা অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ বলে মনে করে। কথাবার্তা ও চালচলনে উদ্ধত্য এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে ড্রিম অ্যানালিসিস করে ইনডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপি-র সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে হয়।

(জ) ডিপেণডেন্ট পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Dependent Personality Disorder) — যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবসময় অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় ও ফলস্বরূপ হীনমন্যতায় ভোগে, আর খুবই দুর্বল মনের হয়। অসহায় মানসিকতার জন্যে এরা পরমুখাপেক্ষী ও অন্যের বশংবদ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। এই ধরনের কিশোরীরা সব ব্যাপারে অতিশয় বাধ্য প্রকৃতির হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়ে নিজেদের দাবী বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে শঙ্কিত হয়। মনের জোর কম থাকার জন্য এদের স্বাধীন ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধার সৃষ্টি হয়। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি যথেষ্ট কার্যকরী হয়।

(ঝ) স্কিজো-টাইপাল পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Schizo-Typal Personality Disorder) — এদের অপরিচিত লোকজনের সাথে মিশতে খুবই জড়তা দেখা যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের চিন্তাভাবনা হঠাৎ এদের মনে উদয় হয় ও মনঃশ্চক্ষে এরা নানাকিছু দেখতে পায়। এদের মন কুসংস্কারে বিষিয়ে থাকে। এরা খুব সন্দেহবাতিক হয় আর মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা থাকতে পছন্দ করে। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে আগের দিনে ইসিটি বা Electro Convulsive Therapy দেওয়ার প্রচলন ছিল। বর্তমানে ক্যাথারসিস মেথোড অফ সাইকো-অ্যানালিসিস পদ্ধতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয়। কগনিটিভ বিহেভিওর থেরাপি-ও ফলদায়ক।

(ঞ) অ্যাভয়ডেন্ট পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Avoidant Personality Disorder) — অন্যের সমালোচনা এরা একদম সহ্য করতে পারে না। কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার ভয়ে এরা নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে বেরোতে চায় না। এদের কোনো গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আগ্রহ থাকে না, অনেকেই আবার সবসময় সামাজিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলতে চায়। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে গ্রুপ সাইকোথেরাপি ও ডাইরেকটিভ কাউন্সেলিং পদ্ধতি সুফল দেয়।

(ট) প্যাসিভ-অ্যাগ্রেসিভ পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Passive-Aggressive Personality Disorder) — কিছু করতে বললেই এরা মুখ গোমড়া করে থাকে বা কেউ কেউ অযথা তর্ক শুরু করে। অনেকে আবার কোনো কাজ করতে দিলে, তা অক্লেশে ভুলে যায়। নিজের কর্মদক্ষতার উপর এদের অসীম আস্থা, যদিও কোনো কাজ এরা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পারে না। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি ও পজিটিভ রিইনফোর্সমেণ্ট থেরাপি যথেষ্ট সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়।

(ঠ) বর্ডারলাইন পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার (Borderline Personality Disorder) — এরা যে কোনো রাগ দীর্ঘদিন মনে পুষে রাখে। ড্রাগ ও মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এরা অল্পেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে, অকারণে মারাত্মক রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। নিজের অঙ্গহানি করে বা আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করে। এরা কখনো গভীর অবসাদে ডুবে থাকে, আবার হঠাৎ করে তুমুল হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। এই ধরণের ব্যক্তিত্বের বিকারে একলেকটিক কাউন্সেলিং ও অ্যাব্রিঅ্যাকশন মেথোড অফ সাইকোঅ্যানালাইসিস আশানুরূপ ফল দেয়। বর্তমানে সাইকোডায়নামিক অ্যাপ্রোচ-এর মাধ্যমে অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন-এর সাহায্যে রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিওর থেরাপি-ও এক্ষেত্রে ভালো ফল দেয়।

Chapter -- 22

ছাত্র-ছাত্রীদের মদ ও ড্রাগের নেশা ঃ সমস্যা ও প্রতিকার

(ক) ড্রাগ ও মদে আসক্তির কারণ

১. বাবা-মায়ের কেউ বা বাড়ির অন্য কেউ মদ্যপানে আসক্ত থাকলে কৈশোরে ছাত্র-ছাত্রীরা নেশাশক্ত হয়ে পড়তে পারে।

২. অনেকে কৌতূহল বশে বা চিত্ত বিনোদনের জন্যে, স্কুলের সহপাঠীদের পাল্লায় পড়ে নেশার সামগ্রী ব্যবহার শুরু করে।

৩. স্কুলের নবীন-বরণ বা বার্ষিক ফাংশনের সময় আমোদ-আহ্লাদে মেতে সাময়িক উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য অনেকে নেশাদ্রব্য সেবন করে।

৪. স্কুলে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়লে ও পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য না পেতে পেতে ব্যার্থতার গ্লানি ও উৎকণ্ঠা আর অবসাদ থেকে অনেকে ড্রাগ অ্যাডিকটেড হয়ে পড়ে।

৫. স্কুলজীবনের ব্যার্থ প্রেম বা শিক্ষকমহাশয়দের অপমানকর নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণ ভুলে থাকার জন্যে অনেকে মদ বা অন্য নেশায় আসক্ত হয়।

(খ) ড্রাগ ও মদে আসক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া

১. অত্যধিক মদ্যপানের প্রভাবে দেহে থায়ামিন ভিটামিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে অ্যামনেসিয়া বা স্মৃতিহ্রাস হয় ও স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. অপরিমিত মদ্যপান লিভার সিরোসিস, প্যানক্রিয়াটিক কারসিনোমা বা ম্যালিগন্যান্ট হার্ট ডিসিস ডেকে আনতে পারে।

৩. কারুর কারুর এপিলেপটিক ফিট বা ডেলিরিয়াম হতে শোনা যায়। সেরিব্রাল ডিজেনারেশনও হতে পারে।

৪. অ্যালকোহল আর নারকোটিকস্-এর প্রভাবে প্যারানয়েড ডিল্যুসন, হ্যালুসিনেশন, অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক রোগ কিংবা নানান পারসন্যালিটি ডিসঅর্ডার দেখা দেয়।

৫. এমন অনেক নেশার সামগ্রী আছে যাতে ইমশন্যাল ইণ্টালিজেন্স নষ্ট হয়ে Dementia বা স্মৃতিলোপ দেখা দেয়।

(গ) ড্রাগ ও মদে আসক্তির প্রতিকার

১. অ্যালকোহলের প্রভাবে শারীরিক যে সব ক্ষতিসাধন হয়েছে বা রোগের সৃষ্টি হয়েছে তার ঔষধপ্রয়োগে যথাশীঘ্র চিকিৎসা করতে হবে। একে বলা হয় ড্রাগ ডি-টকসিকেশন।

২. মদের আসক্তি না কাটা পর্যন্ত তাকে বিকল্প এমন কিছুর উপর নির্ভর করার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে যা তার দৈহিক বা মানসিক কোন ক্ষতির কারণ হবে না।

৩. মদের নেশা ছাড়িয়ে তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আচরণ পরিবর্তনকারী মনোচিকিৎসা বা বিহেভিওর‍্যাল সাইকোথেরাপি-র ভরপুর সাহায্য নিতে হবে।

৪. বলে বুঝিয়ে রাজী করিয়ে মদ ছাড়ানোর পরে যেসব উইথড্রয়াল সিনড্রোম হবে, তার আশু সমাধান করতে হবে।

৫. ড্রাগ নির্ভরতার চিকিৎসার জন্য রোগীকে ভালো কোনো মেণ্টাল স্যানাটোরিয়াম (Mental Sanatorium)-এ রেখে মানসিক সাহচর্য দিলে ও তার আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিলে, রোগীকে সুস্থ জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সে আবার লেখাপড়ায় উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

(ঘ) সন্তান মদ আসক্তি জানতে বাবা-মায়ের কী করণীয়

১. আপনার সন্তান যদি দেখেন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে না, প্রাইভেট টিউশনে যাচ্ছে না, বদমেজাজী হয়ে উঠেছে, কথায় কথায় স্কুলের সহপাঠীদের সাথে বা পাড়ার ছেলেদের সাথে হাতাহাতি করছে কিংবা তার স্টাডিরুমে বা বাথরুমে সিগারেটের রাংতা পড়ে আছে – তাহলে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখুন।

২. তার শরীরে অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন নজরে আসছে কিনা খেয়াল করুন। কথাবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে কিনা, বাড়ি ফেরার পরে তার চোখ লালচে হয়ে থাকে কিনা, স্ট্যাগারিং গ্যেট বা টাল-মাটাল পায়ে হাঁটছে কিনা, তার মুখ দিয়ে উগ্র কটু গন্ধ বেরুচ্ছে কিনা বা তার হাতে ইনজেকশন-এর দাগ আছে কিনা, ইত্যাদির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

৩. আপনার সন্তান ড্রাগ নিতে শুরু করেছে জানতে পারলে হঠাৎ করে প্রচণ্ড রাগান্বিত হবেন না। প্রথমে ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে তাকে ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করুন ও তার সমস্যার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করুন সহানুভূতিশীল মানসিকতা নিয়ে। খোঁজ নিন আর কথা বলুন তার বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে। ফ্যামিলির সবাই প্যানিকড হয়ে সাংঘাতিক রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে যাবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হবে।

৪. কখনোই আপনারা তাকে খারাপ ছেলে বা মেয়ে বলে কলঙ্ক চাপিয়ে দেবেন না বা নেশা করার জন্যে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। বাড়ির কেউ তার সাথে অপমানকরভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কথাবার্তা বলবেন না।

৫. দু'-একবার ড্রাগ নিয়ে কেউ ড্রাগ অ্যাডিকটেড্ হয়ে পড়ে না। সেজন্যে আপনার নেশাশক্ত সন্তানকে চিকিৎসার জন্যে বলে বুঝিয়ে কোনো মেডিক্যাল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগে নিয়ে যান।

লার্নিং ডিসএবিলিটি

Chapter -- 23

লার্ণিং ডিসএবিলিটি ঃ
শিখণ প্রক্রিয়ার নানা সমস্যা

অ্যামনেসিয়া (Amnesia)

(ক) অ্যামনেসিয়া — শারীরিক আঘাত, ড্রাগ নির্ভরতা বা মানসিক আঘাত থেকে সৃষ্ট এটা এক ধরণের আংশিক বা সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা।

১. অ্যান্টেরোগ্রেড অ্যামনেসিয়া (Anterograde Amnesia) — এই প্রকারের অ্যামনেসিয়াতে নতুন জিনিস শিখতে অসুবিধা হয় আর সদ্য শেখা জিনিসগুলো ভুলে যায়, মনে করতে পারে না।

২. রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া (Retrograde Amnesia) — এই ধরণের অ্যামনেসিয়াতেও নতুন জিনিস শিখতে সমস্যা হয় আর অতীতে শেখা জিনিসগুলো ভুলে যায়, মনে করতে পারে না অতীতের ঘটনাবলী।

৩. অ্যামনেসিয়া এজিটাটা (Amnesia Agitata) — দৈহিক ও মানসিক অস্থিরতার জন্যে এই ধরণের অ্যামনেসিয়াতে আংশিক স্মৃতিভ্রংশ দেখা যায়।

৪. অরগ্যানিক অ্যামনেসিয়া (Organic Amnesia) — এই ধরণের অ্যামনেসিয়াতে ব্রেনের নার্ভ-সংক্রান্ত রোগের জন্যে স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

৫. ট্রম্যাটিক অ্যামনেসিয়া (Traumatic Amnesia) — এই প্রকারের অ্যামনেসিয়াতে ব্রেনের আঘাত জনিত কারণে বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬. সাইকোজেনিক অ্যামনেসিয়া (Psychogenic Amnesia) — মানসিক ব্যাধির কারণে এই ধরণের অ্যামনেসিয়াতে মেধাহ্রাস ও স্মৃতিসমস্যা দেখা দেয়।

অ্যাফেসিয়া (Aphasia)

(খ) অ্যাফেসিয়া — এটা এক ধরণের ভাষা বোঝা ও প্রকাশ করার সমস্যা, যেটা ব্রেনের ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারে কোনো রোগ বা আঘাতপ্রাপ্তির জন্যে হয়ে থাকে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে ও পড়তে অসুবিধা হয় আর শব্দ উচ্চারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

১. অ্যাকাউস্টিক-অ্যামনেস্টিক অ্যাফেসিয়া (Acoustic-Amnestic Aphasia) — এই ধরণের অ্যাফেসিয়াতে শিক্ষার্থীরা শব্দতালিকা পরপর স্মরণ করতে পারে না, এমনকি বড় একটা বাক্যাংশ পুনরায় বলতে বললে সে তা পারে না। ব্রেনের বাঁ দিকের টেম্পরাল লোব-এর ক্ষতের জন্য এই অসুবিধা দেখা দেয়।

২. অ্যাগ্রামাটিসম (Agrammatism) — এই ধরণের অ্যাফেসিয়াতে ছাত্র ছাত্রীরা বাক্যে সঠিকভাবে শব্দগুচ্ছ সাজাতে পারে না। শিক্ষার্থীরা উপরিউক্ত ফাংশন ওয়ার্ড-গুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। অনেক ছোটো বাচ্চা টেলিগ্রাফিক স্পিচ-এ কথা বলে, যাতে তারা ফাংশন ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে ভুলে যায়। গ্রামারে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের জন্যে শব্দের ফর্ম ভুল স্থানে ব্যবহার করে। গ্রামারের সম্পর্ক বিন্যাসে অনেক ছোটরা সমস্যামূলকভাবে ভুলভ্রান্তি করে। এবং ক্রিয়ার কাল নির্ণয়ে অসুবিধায় পড়ে।

৩. অ্যানোমিক অ্যাফেসিয়া (Anomic Aphasia) — এই ধরণের অ্যাফেসিয়াতে বাচ্চারা কোনো বস্তুর নাম বলতে বা সেই বস্তুটির সম্পর্কে বর্ণনা দিতে অসুবিধায় পড়ে।

৪. ব্রোকা'স অ্যাফেসিয়া (Broca's Aphasia) — আমাদের সেরিব্রাল কর্টেকস্-এ অবস্থিত 'ব্রোকা'স এরিয়া'-র ক্ষয়ক্ষতির ফলে কথা-বলা জড়িয়ে যায়, স্পষ্ট উচ্চারণে সমস্যা হয়— যদিও এই প্রকারের অ্যাফেসিয়াতে ভাষা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

৫. কনডাকশন অ্যাফেসিয়া (Conduction Aphasia) — এই ধরণের অ্যাফেসিয়াতে একবার উচ্চারিত শব্দ পুনরায় উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয় এবং জানা সত্ত্বেও ঠিক শব্দগুচ্ছ সাজিয়ে কথা বলতে পারে না।

৬. লোলাপ্লেজিয়া (Lolaplegia) — ভোকাল কর্ড-এ মাংসপেশীর প্যারালিসিস-এর জন্যে এটি এক ধরণের ভাষা প্রকাশের সমস্যা।

৭. অপটিক অ্যাফেসিয়া (Optic Aphasia) — এই রকমের অ্যাফেসিয়া-তে বাচ্চারা চোখে দেখেও বস্তুর নাম বলতে পারে না কিন্তু তা স্পর্শ করে বস্তুটির নাম বলতে পারে।

৮. স্পাসমোফ্রেমিয়া (Spasmophemia) — এই ধরণের অ্যাফেসিয়া-তে ভোকাল কর্ড-এর মাংশপেশীর খেঁচুনীর জন্যে ভাষা প্রকাশের সমস্যা হয়।

৯. সিনট্যাকটিক অ্যাফেসিয়া (Syntactic Aphaisa) – এটা এক ধরণের অ্যাফেসিয়া যাতে বাচ্চারা গ্রামারের পারম্পর্য মেনে শব্দ ব্যবহার করে বাক্য গঠন করতে পারে না।

১০. ট্যাকটাইল অ্যাফেসিয়া (Tactile Aphasia) – এই প্রকারের অ্যাফেসিয়াতে বাচ্চারা শুধুমাত্র স্পর্শ করে বস্তুর নাম বলতে পারে না, যতক্ষণ না সে তা চোখে দ্যাখে।

১১. ট্রান্সকরটিক্যাল অ্যাফেসিয়া (Transcortical Motor and Sensory Aphasia) – কর্টেকস্ থেকে মটর বা সেনসরি এরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যে এই ধরণের অ্যাফেসিয়া-তে বাচ্চারা একনাগাড়ে আবোল-তাবোল বকে যেতে থাকে।

১২. ওয়ারনিক'স অ্যাফেসিয়া (Wernicke's Aphasia) – এই ধরণের অ্যাফেসিয়াতে ওয়েরনিকস এরিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে ভাষা বোঝার সমস্যা হয়।

ডিসলেকসিয়া (Dyslexia)

(গ) ডিসলেকসিয়া – ডিসলেকসিয়া হল ভাষা-সংক্রান্ত শেখার ক্ষমতার অভাব। এই সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীর পড়তে লিখতে আর বানান করতে অসুবিধা হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর নতুন নতুন শব্দ চিনতে অনেক বেশী সময় লাগে, এরা সমবয়সীদের তুলনায় দেরীতে কথা বলতে শেখে, কথা বলার সময় এদের উপযুক্ত সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। অনেক বাচ্চার অক্ষর পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, কেউ কেউ আবার নিজের নাম বানান করে বলতে বা লিখতে সমস্যায় পড়ে। কারুর কারুর লেখায় কিছু কিছু অক্ষর উল্টে-পাল্টে যায়, দুটি অক্ষরের মধ্যে মিল থাকলে তাদের প্রভেদ বুঝতে সমস্যা হয়।

১. অ্যালেকসিয়া (Alexia or Acquired Dyslexia) – মস্তিষ্কের বাঁ দিকের অংশে আঘাতের জন্যে এই ধরণের ডিসলেকসিয়া-তে পড়তে পারার অসুবিধা হয়।

২. ডেভেপলমেণ্টাল ডিসলেকসিয়া (Developmental Dyslexia) – এই ধরণের ডিসলেকসিয়া-তে বাচ্চারা পড়তে ও লিখতে শেখে না সহজে, যা ধীরে ধীরে শিখন-সংক্রান্ত মারাত্মক অসুবিধা তৈরি হয়।

৩. ক্যাটালেকসিয়া (Catalexia) – এই ধরণের ডিসলেকসিয়া-তে শিশুরা একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বারংবার উচ্চারণ করে।

৪. স্পেলিং ডিসলেকসিয়া (Spelling Dyslexia) – এই প্রকারের ডিসলেকসিয়া-তে বাচ্চারা প্রত্যেকটা শব্দে থেমে থেমে খুব ধীরে ধীরে পড়ে যেতে পারে।

৫. ফোনোলজিক্যাল ডিসলেকসিয়া (Phonological Dyslexia) – যাদের এইরকম ডিসলেকসিয়া থাকে, সেই সব বাচ্চাদের শব্দের সঠিক উচ্চারণে খুবই অসুবিধা হয়।

অ্যাপ্রাকসিয়া (Apraxia)

(ঘ) অ্যাপ্রাকসিয়া – অ্যাপ্রেকসিয়া শিশুরা যথাযথ শারীরিক অঙ্গচালনায় সড়গড় হতে পারে না। যে অঙ্গভঙ্গি সে যে উদ্দেশ্যে দেখাতে চাইছে, তা সে পারে না। মস্তিষ্কের প্যারাইটাল লোবের রোগ এই অসুবিধার কারণ।

১. অ্যাকাইনেটিক অ্যাপ্রাকসিয়া (Akinetic Apraxia) – এতে অঙ্গচালনার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীমার ব্যবহারের অসুবিধা হয়।

২. কন্সট্রাকশন্যাল অ্যাপ্রাকসিয়া (Constructional Apraxia) – এই সমস্যা থাকলে শিশুরা খুব সহজ ড্রয়িং বা প্যাটার্ন দেখে নিজে তা আঁকতে পারে না।

৩. অ্যামনেস্টিক অ্যাপ্রাকসিয়া (Amnestic Apraxia) – এতে কেউ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দেখাতে বললে শিশু তা পারে না।

৪. গ্যেট অ্যাপ্রাকসিয়া (Gait Apraxia) – এই ধরণের অ্যাপ্রেকসিয়াতে শিশু সহজে হাঁটতে পারে না।

৫. আইডিয়েশন্যাল অ্যাপ্রাকসিয়া (Ideational Apraxia) – এতে আগেই খুব ভালোভাবে শেখা অঙ্গভঙ্গী বারবার অনুকরণ করতে বাচ্চার অসুবিধা হয়।

৬. প্যারামিমিয়া (Paramimia) – যে অঙ্গভঙ্গী যেমনভাবে দেখানো দরকার বাচ্চা তা পারে না।

৭. অকিউলোমোটর অ্যাপ্রাকসিয়া (Occulomotor Apraxia) – শিশুরা এতে তাকানোর ভঙ্গীমাতে অসুবিধায় পড়ে।

৮. আইডিওকাইনেটিক অ্যাপ্রাকসিয়া (Ideokinetic Apraxia) – অচেনা অঙ্গচালনা এই সমস্যায় শিশুরা অনুকরণ করে দেখাতে পারে না।

৯. স্পিচ্ অ্যাপ্রাকসিয়া (Speech Apraxia) – এতে শিশুরা স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারে না।

১০. ইউনিল্যাটেরাল লিম্ব অ্যাপ্রাকসিয়া(Unilateral Limb Apraxia) – যাদের বামদিকের এই সমস্যা আছে, তাদের বামহাত দিয়ে কোনো কাজ করতে বললে তারা পারে না।

অ্যাগনোসিয়া (Agnosia)

(ঙ) অ্যাগনোসিয়া — অ্যাগনসিয়া-তে শিশু তার অনুভূতি যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনকি তার চারপাশের পরিচিত জিনিসপত্রও চিনতে পারে না। অনেকে আবার পরিবারের লোকজনদেরও চিনতে সমস্যায় পড়ে।

১. অডিটোরি অ্যাগনোসিয়া (Auditory Agnosia) — এতে শিশু পরিচিত আওয়াজ বা আগে-শোনা শব্দও ঠিকঠাক চিনতে পারে না।

২. অ্যাহাইলোগনসিয়া (Ahylognosia) — এতে বাচ্চারা স্পর্শ করে বস্তু পৃথক করতে পারে না।

৩. কালার অ্যাগনোসিয়া (Colour Agnosia) — এতে শিশুদের রঙ চিনতে অসুবিধা হয়।

৪. অ্যামরফোগনসিয়া (Amorphognosia) — এতে শিশু স্পর্শ করে বস্তুর গঠন ও আকার বোঝাতে পারে না।

৫. গাসটেটরি অ্যাগনোসিয়া (Gustatory Agnosia) — এতে বাচ্চারা স্বাদ চিনতে অসুধিায় পড়ে।

৬. অপটিক অ্যাগনোসিয়া (Optic Agnosia) — এতে শিশুর দেখা বস্তু চিনতে সমস্যা হয়।

৭. প্রোসোপাগনাসিয়া (Prosopagnosia) — এতে বাচ্চা আগে দেখা মুখ এমনকি নিকট আত্মীয়ের মুখমণ্ডল চিনতে পারে না।

৮. অলফ্যাকটরি অ্যাগনোসিয়া (Olfactory Agnosia) — এই ধরনের অ্যাগনেসিয়া-তে শিশুরা গন্ধ চিনতে পারে না।

৯. টপাগনোসিয়া (Topagnosia) — শিশু এতে তার দেহের কোন্ অংশে স্পর্শ করা হচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারে না।

১০. ভিস্যুয়াল শেপ অ্যাগনোসিয়া (Visual shape Agnosia) — এই ধরণের অ্যাগনেসিয়াতে শিশুরা একই ধরণের বস্তুগুলো পৃথকভাবে চিনতে ও নাম লিখতে পারে না।

বিভিন্ন লার্নিং ডিসঅর্ডার্স-এর প্রতিকার ও চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

নানাধরণে সেনসরি ইনটিগ্রেটেড থেরাপির সাহায্যে বিবিধ লার্নিং ডিসএবিলিটির প্রতিকারের প্রয়াস করা হয়। ভিসুয়াল ট্রেনিং, ডোমান ডিলোকাটা মেথোড, টিনটেড লেন্স ট্রিটমেণ্ট, হাইপোগ্লাইসেমিয়া ডায়েট, ল্যাটারালিটি ট্রেনিং, মেগাভিটামিন ও মিনারেল থেরাপি ইত্যাদির সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এই সমস্যার প্রবণতা হ্রাস করা করা যায়। অ্যানটেরোগ্রেড ও রেট্রোগ্রেড অ্যাসনেসিয়া প্রতিরোধে ইকোসা পেণ্টানোয়িক অ্যাসিড (ইপিএ) ও মাইক্রোনিউটিয়েণ্টস্ সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার সামগ্রী অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। কনডাকশন অ্যাফেসিয়া ও ডেভেলপমেণ্টাল ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের জন্যে ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারটি মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত যোগান থাকা জরুরী-- যা মটরশুঁটি ও কুমড়ো বীজ থেকে পাওয়া যায়। অ্যাকাইনেটিক অ্যাপ্রেক্সিয়া, স্পিচ অ্যাপ্রেক্সিয়া ইত্যাদিরক প্রতিকারে অ্যাসিটাইল কোলিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারের ভূমিকা অনবদ্য— যা পাওয়া যায় ডিমের কুসুম ও পিনাট থেকে। অপটিক অ্যাগনেসিয়া, ভিস্যুয়াল শেপ অ্যাগনসিয়া ও অডিটারি অ্যাগনসিয়া ইত্যাদির প্রতিকারে গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড (জিএবিএ)-এর অবদান অনস্বীকার্য্য-- যা পাওয়া যায় বাদাম, লেবু, আনারস, ক্যাপসিকাম, সবুজ শাক ও ওটমিল থেকে। অরগ্যানিক অ্যামনেসিয়া, সিনট্যকটিক অ্যাফেসিয়া ইত্যাদি সমস্যায় শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেরোটোনিন-এর জোগান থাকা জরুরী— যা পাওয়া যায় ব্রাউন রাইস, হোলহুয়িট ব্রেড, কলা, ছানা ইত্যাদি থেকে। এছাড়া তরমুজে থাকা লাইকোপিন নামক অ্যাণ্টি-অক্সিডেণ্ট, কমলালেবুতে লভ্য ক্যারোটিনয়েডস্, গাজরে থাকা লিউটিওথিন, ইত্যাদি বিবিধ লার্নিং ডিসঅর্ডার্স-এর প্রতিকারে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

গুড প্যারেন্টিং স্কিলস্

Chapter -- 24

সন্তানের মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা

১. নিচু ক্লাশের বাচ্চাদের গল্পের বই থেকে পাঠ করে শোনালে, তার বই পড়ার প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

২. লেখাপড়ার পাশাপাশি আপনার শিশুকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করুন। পরে পরে তাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নেবার সুযোগ দিন। তবে হারার জন্যে নয়, জেতার জন্যে তাকে প্রাণিত করুন আর তার খেলার মানকে যোগ্যতম করে তুলতে সাহায্য করুন।

৩. বাচ্চাদের কাজের অযথা যখন-তখন সমালোচনা করবেন না। বা তাকে সামান্য কারণে বকাঝকা করবেন না। এতে বাচ্চার মানসিক বিকাশ গতিরুদ্ধ হয়।

৪. সুযোগ থাকলে বাচ্চার কাজের আন্তরিক প্রশংসা করুন। সেই কাজটি করতে যদি তার খুব বেশি কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আপনিও যে তাতে কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

৫. আপনি কখনোই নিজের সন্তানকে বলবেন না যে তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে তোমাকে আমি একটা ঘড়ি কিনে দেবো। ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্যের জন্যে সবসময় পুরস্কার পেতে অভ্যস্ত হলে তার সাফল্যের গুরুত্ব কমে যাবে। পুরস্কারের কোনো শেষ নেই। পুরস্কারের লোভে সন্তানের অন্য অনেক কিছুর চাহিদা পর পর বাড়তেই থাকবে।

৬. সন্তানকে হাসি-খুশি রাখার জন্যে যা যা করার করতে হবে।

৭. স্কুলে পড়াশোনা বা পড়াশোনা ছাড়া অন্য কি কি হল আজ তাই নিয়ে সন্তানের সাথে কথা বলুন। পিতা-মাতার স্কুল-সংক্রান্ত এই ধরণের আগ্রহ লেখাপড়ার প্রতি শিশুদের অধিক মনোযোগী করে তোলে।

Chapter -- 25

সৃজনশীলতার বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা

(ক) আপনি আপনার সন্তানকে নিয়মিত স্কুলে পাঠাবেন। বাড়িতে লেখাপড়ার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেবেন। সপ্তাহান্তে তার পড়াশোনার উন্নতির ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। মনে রাখবেন, সব ছাত্র-ছাত্রীর আই-কিউ সমান হবে না। আপনি সুতরাং আপনার সন্তানের রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড পারফরমেন্স-এ সন্তুষ্ট থাকবেন। তার শিক্ষার ব্যাপারে অতিরিক্ত উচ্চাশা করে, নিজের ও সন্তানের মানসিক অবসাদ ডেকে আনবেন না।

(খ) আপনার সন্তানের সৃজনশীলতার ব্যাপারে অযথা নাক লগাবেন না বা তার সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে বাধাদান করবেন না। স্কুলপাঠ্যের বাইরের বিষয়ে যে সব ছাত্র-ছাত্রী আগ্রহী হয়, তাদের সৃজনশীলতার বিকাশের জন্যে অভিভাবকদের অবশ্য উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া দিতে হবে। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের আই-কিউ সাধারণত অ্যাবাব অ্যাভারেজ হয়ে থাকে।

(গ) আদর্শের সাথে মানুষ করার পর সন্তানকে আপনি আপেক্ষিকভাবে একটু বেশি স্বাধীনতা দিন। সন্তানের মনের পরিধি যত বিস্তৃত হবে, তার সৃজনশীল হবার প্রবণতা তত বাড়বে।

(ঘ) ছোট থেকেই সন্তানরা পিতা-মাতাকে বেশিমাত্রায় অনুকরণ করে। আপনি নিজে সুতরাং সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহী হোন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পছন্দের ক্রিয়েটিভ ফিল্ড-এ অংশগ্রহণ করুন। দেখবেন, আপনার সন্তানও আপনার পদাঙ্ক অনুসণ করছে। আমজাদ আলি খানের দুই ছেলে (আমান ও আয়ান আলি) দেখুন বাবার মত সরোদিয়া হয়েছে। এমন অনেক উদাহরণ আপনিও জানেন।

(ঙ) নিজের সন্তানের ভালোলাগার ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহিত করুণ আর তার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য তার সিদ্ধান্তগুলোকে সম্মান করতে শিখুন। কখনো নিজের সন্তানের সাফল্যকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবেন না। বরং তার কাজকর্মে ও ফিউচার প্ল্যান-এর উপর অনাবিল আস্থা রাখুন।

(চ) ছোট থেকে আপনার সন্তানকে মূল্যবোধ শেখাবেন। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ বুঝতে শিখলে, সে আর বিপথগামী হবে না। আদর্শের সুস্পষ্টতাই সৃজনশীল জীবনের সফলতা।

(ছ) আপনার সন্তানকে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী হতে সুযোগ করে দিন। আপনি তাকে নিয়ে কী কী ভাবছেন, তা তার সাথে আলোচনা করুণ। তার জীবনের প্রসেস অব সাকসেস-এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে রাখুন।

(জ) স্কুলের বার্ষিক রেজাল্ট-এ কত নাম্বার পেল বা অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় কতটা ভালো বা খারাপ ফল করলো, তাই নিয়ে অযথা ব্যাকুল হবেন না। একটি পরীক্ষার রেজাল্টই শেষ কথা নয়। মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে বেশি নাম্বার পাওয়ার থেকে ইমাজিনেটিভ পাওয়ার সৃজনশীলতার চর্চা ও মূল্যবোধের শিক্ষার চর্চা জীবনে সাফল্যের জন্যে অনেক বেশি জরুরী।

Chapter -- 26

ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণে মাতা-পিতার করণীয়

১. আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে আপনার সন্তানকে মানুষ করুণ। তার ছোটো ছোটো ভালো কাজের প্রসংশা করুন। বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তাঁদের সন্তান যেন পরিবার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সবার হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে।

২. নিজের সন্তানকে সবসময় সুস্থ প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশের মধ্যে বড়ো করে তোলার চেষ্টা করুন। কখনোই তাকে অন্যের সন্তানের সাফল্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত বা পরশ্রীকাতর হতে শেখাবেন না। আদর্শ প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরিমণ্ডলে কিশোর-কিশোরীরা বড়ো হলে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের কাঙ্খিত সাফল্য আসবে।

৩. নিজের সন্তানকে সবসময় মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়-নীতি চর্চা করার শিক্ষা দিতে হবে। বাবা-বাকে সর্বদা সন্তানকে বোঝাতে হবে সৎ আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে না পারলে জীবনে মহৎ চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

৪. ছেলেবেলা থেকে সন্তানকে শৃঙ্খলাপরায়ণতার শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রজীবনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে না রাখতে পারলে, তারা অ্যাকাডেমিক লাইফ-এ সাফল্য পাবে না।

৫. ধর্মচর্চার সাথে জড়িত নানা অন্ধ কুসংস্কার আমাদের সমাজে প্রচলিত, এগুলো থেকে কিশোর কিশোরীদের রক্ষা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার পরিপন্থী। জোর করে কখনোই আপনার সন্তানের কানে ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের মন্ত্র শেখাবেন না। এর ফলে সে পাপবোধ, কুসংস্কার ও মিথ্যা ভয়ের কবলে পড়ে দুর্বলচিত্তের মনোরোগীতে পর্যবসিত হয়।

৬. সন্তানকে যখন-তখন অতিরিক্ত শাসন করা উচিত নয়। তার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হবে বা তাকে যা-যা করতে আদেশ দেওয়া হবে, তার মধ্যে যেন সঙ্গতি থাকে। কিশোর-কিশোরীদের সাথে ব্যবহারে অসঙ্গতির জন্যেই তারা পরবর্তী জীবনে অবসেসিভ কমপালসিভ নিউরোসিস (Obsessive Compulsive Neurosis) রোগের শিকার হয়ে পড়ে। আর একটা কথা মা-বাবাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, কারণে-অকারণে যখন-তখন যেন তাকে সমালোচনা করা না হয়। অতিরিক্ত সমালোচনা, অন্যায় শাসন, তিরস্কার বা নিষ্ঠুর আচরণ আপনার সন্তানকে অবাধ্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে সে অপরাধ-প্রবণ হয়ে সমাজদ্রোহীতার শিকার হয়ে পড়বে।

৭. কৈশোর বয়সেই আপনার সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্যে যে সব আকাঙ্খা পোষণ করছে, তার বাস্তব ভিত্তি থাকলে সেগুলিকে উৎসাহিত করুন। বাবা-মায়ের কখনোই বলা উচিত নয়, তোমার দ্বারা ওটা হবে না বা তমি ওটা করতে পারবে না। তার নিজের ভুল থেকে তাকে শিখতে দিন, আপনারা শুধু তার ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে শুধরে দেবার চেষ্টা করুন।

৮. কেমন ধরণের বন্ধু দের সাথে আপনার সন্তান মিশছে, তা চোখে-চোখে রাখুন। অন্য বাইরের লোকজনের সামনে কখনোই তাকে ভৎর্সনা বা অপমান করে খাটো করবেন না। তাকে আপনি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আর ছোটোদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে শেখান। পিতা-মাতার সংযমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন-যাপন সন্তানের মানসিক বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে।

৯. পিতা-মাতার মধ্যেকার মনোমালিন্য ও অশ্রদ্ধার সম্পর্ক সন্তানের মনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয় ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। গৃহের পরিবেশে দ্বিচারিতা, অশান্তি বা মাদকাশক্তির চল থাকলে আপনার সন্তান আশ্রয়হীন বা আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে এবং অচিরে সে অটিসটিক চাইল্ড-এ পরিণত হবে। বাড়িতে যখন-তখন ঝগড়াঝাঁটি হলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। মানসিক চাঞ্চল্য আর ভয়ের পরিমণ্ডল আপনার সন্তানের পড়াশোনা করার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়।

১০. আপনার সন্তানের খাদ্য-তালিকায় যেন ব্যালেন্স ডায়েট থাকে। তাকে দুধ-ঘি-ফলমূল খেতে উৎসাহিত করবেন, কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্ক, বা জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত পানাহার সুস্থ শরীরের ও মনের

চাবিকাঠি। তার মধ্যেকার সৃজনস্পৃহাকে বাবা-মায়ের উচিৎ উৎসাহিত করা, কেননা সৃজনশীলতার চর্চার মাধ্যমেই আপনার সন্তান সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাবে। আপনার কিশোর পুত্র বা কিশোরী কন্যার আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা দেবেন, তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মস্ফূরণের চাহিদা পূরণের জন্যে আন্তরিক সাহায্য করবেন। আপনাদের সামর্থ্যমত তার কৌতূহলের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করবেন।

১১. আপনার সন্তান পরীক্ষায় আশশনুরূপ ফল না করলে বা অসফল হলে, তার জন্যে আপনি নিজেকে দোষারোপ করে অযথা ফ্রাসট্রেশনে ভুগবেন না। বরং আপনি সন্তানকে শেখান, ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতাকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হয়। আর তারপর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে পরবর্তী বৃহত্তর সাফল্যের জন্যে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

১২. অনেকে আছেন সন্তান ভালোভাবে লালন-পালনের জন্যে ভালো একটা চাকরিও ছেড়ে দেন। আমি বলি, শুধু সন্তানের কথা ভেবে চাকরিটা ছাড়বেন না, জীবনে কেরিয়ারটাও সমান জরুরী। বাড়িতে ঠিকঠাক একটা সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করতে পারলে, সন্তানের লেখাপড়ায় অসুবিধা হবে না। আজকের দিনে সন্তান মানুষ করার খরচ অনেক, আপনার একটা ভদ্রস্থ রোজগার থাকলে পরবর্তী জীবনে হতাশার সম্মুখীন হতে হবে না।

১৩. শুধুমাত্র পড়াশোনার গুণমানের বিচারে আপনার সন্তানকে বিচার করবেন না। লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে আধুনিক নানান একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি -র প্রতি আগ্রহান্বিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। নিয়মিত খেলাধূলার সুযোগ দেওয়া, ভালো গান-বাজনার চর্চা বা নৃত্যশিক্ষার চর্চা তার মানসিক বিকাশের সহায়ক।

১৪. আপনাদের দাম্পত্য কলহের প্রভাব যেন সন্তানের উপর কদাচ না পড়ে। এছাড়া, সংসারের নানাবিধ জটিল টানা-পোড়েনে ও সমস্যায় আপনার ছেলে-মেয়েকে জড়াবেন না। ওদের সহজ সরল মানসিকতার ভাবজগতে নৈতিক অধঃপতনের পাঁক লাগলে, ওরা আর কখনোই গুরুজনদের প্রাপ্য সম্মান দিতে শিখবে না।

১৫. আপনার সন্তানকে একজন আলাদা ইনডিভিজুয়াল হিসাবে ট্রিট করুন। ভাববেন না, ছোটোদের আত্মসম্মানবোধ নেই। ছেলে-মেয়েরা একটু বড় হলেই তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। নিজেদের মতামত জোরপূর্বক তাদের উপর চাপিয়ে দিলে সমসময় ফল ভালো হয় না।

১৬. আপনার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সন্তান-কেন্দ্রিক করে তুলবেন না। সন্তানকে কতটা আগলে রাখবেন আর কতটা ছাড়বেন, সে ব্যাপারে আপনাকে পরিণামদর্শী হতে হবে। নিরন্তর আদর বা মাত্রাতিরিক্ত শাসন কোনোটাই সন্তানের জন্য শুভ নয়। শুধুমাত্র সন্তানই যদি আপনার ধ্যান-জ্ঞান হয়, তাহলে একটা অস্বস্তিকর দমবন্ধ করা পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা কাঙ্খিত নয়। পরিবারে সবার সাথে সবার সুস্থ সুন্দর সম্পর্ক সন্তানের জীবনকে মধুময় করে তুলবে, সে তখন লেখাপড়ায় সাফল্য পাবে আর একজন ভালো মনের মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে।

১৭. সবশেষে, গুড প্যারেন্টিং-এ অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনিই আপনার সন্তানের প্রথম রোল মডেল। সেজন্যে তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে, যে কোনো মূল্যে তা রাখার চেষ্টা করুন। তার সাথে ব্যবহার করার সময় কখনোই মিথ্যাচারিতার সাহায্য নেবেন না। পিতা-মাতার সততা, সদ্ব্যবহার, বা অন্যান্য ভালো গুণাবলী কালক্রমে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। আর, মনে রাখবেন, আপনাদের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করার জন্য সন্তানের উপর প্রত্যাশার চাপ তৈরি করবেন না। পড়ার চাপ, স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেকার রেষারেষি, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড় ইত্যাদির নানান চাপে সরল অনভিজ্ঞ শিশুমনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেবেন না। সন্তানের পড়াশোনা বা অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স ছাড়াও তার ভালোলাগা-পছন্দ-অপছন্দ স্কুলের বন্ধুবান্ধব, টিচার ও তার ফিউচার প্ল্যানিং নিয়েও বন্ধুর মতো আলোচনা করবেন। এইসব হরেকরকম প্যারেনটিং স্কিলস (parenting skills) আয়ত্ব করতে হলে বদলে ফেলতে হবে আপনাদের পুরানো ধ্যান-ধারণা।

Chapter -- 27

গুড পেরেন্টিং স্কীলস্
বাবা-মায়েরা কি করবেন ও কি করবেন না

১) সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে বাবা-মায়ের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা অটুট রাখতে হবে। পিতা-মাতার মধ্যেকার মতপার্থক্য সন্তানের মনোবিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২) নিজের শৈশব-কৈশোরের অবহেলিত জীবনের কথা মাথায় রেখে অনেক বাবা-মা নিজের সন্তানদের মাত্রাতিরিক্ত আদর-ভালোবাসা ও প্রশ্রয় দেন। এর পরিণতি আখেরে ভালো হয় না, বাবা-মায়ের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় অবহেলা ও দৈনন্দিন জীবনচর্যায় উৎশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সুতরাং মা-বাবা যেমন অতিরিক্ত শাসনের অত্যাচারে সন্তানকে জর্জরিত করবেন না, তেমনি আদরে বাঁদরও তৈরী করবেন না।

৩) আপনার সন্তান দোষ-ত্রুটি করতেই পারে, সংযমী বাবা-মায়ের উচিৎ তাদের সকল দোষ-পদস্খলন স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে দূর করা। ধৈর্য্যশীল ও নিরহঙ্কারী পিতা-মাতার সন্তানে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৪) সন্তান যে বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ে, সেখানে গিয়ে তার সুবিধা-অসুবিধার কথা খোঁজ নিতে হয়। স্কুলের পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, স্কুলে কোনোও ভাবে সে অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা – সেসব খবরাখবর জেনে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

৫) বড়োদের জীবনযাত্রা সরল ও অনাড়ম্বর হলে, মা-বাবা দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমা ও ধৈর্য্যের অনুশীলন করলে – এইসব পবিত্র প্রভাব আপনার সন্তানে প্রতিফলিত হবে।

৬) অনেক পিতা-মাতা অত্যধিক উচ্চাকাঙ্খী ও আকাশপ্রমাণ আদর্শবাদী। সন্তানের ক্ষমতা উপলব্ধি না করতে পেরে তাঁরা আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখেন। কালক্রমে ছেলে বা মেয়ে মা-বাবার সেই আশা-আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হলে পরিবারের সবাই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফ্যালেন ও হীনমন্যতায় ভোগেন।

৭) সন্তানকে আপনি সংযমী, পরিশ্রমী, সত্যবাদী হবার জন্যে অনুপ্রাণিত করবেন। এতে তার জীবনযাত্রা সহজ-সুন্দর হবে এবং সে হবে উন্নত নৈতিক চিন্তায় বলীয়ান। আপনার স্কুল-পড়ুয়া ছেলে বা মেয়ের এতে পাঠে একাগ্রতা বাড়বে ও সে কুশিক্ষা, সঙ্গদোষ ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

৮) দশ-পনেরো দিন অন্তর বা পারলে সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিন কাছেপিঠে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যান। সুস্থ রুচির নানান ধরণের বই, মহাপুরুষদের জীবনী পড়তে তাদেরকে উৎসাহিত করুন।

৯) ছোট শিশুরা স্বভাববশতঃ অনুকরণ করে শেখে। সেজন্যে তাদেরকে স্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশে রাখার ব্যাপারে অতিশয় যত্নশীল হতে হবে। বাড়ীতে বড়োদের রুচিহীন গান-বাজনা শোনা চলবে না, সন্তানের সামনে অ্যাডাল্ট সিনেমা-সিরিয়াল দেখা চলবে না, বাড়ীর কোনো সদস্যের কলহপ্রিয় স্বভাব না থাকাও বাঞ্ছনীয়।

১০) আপনার সন্তানের পড়াশুনা, খেলাধূলা বা আচার-আচরণে ক্রমাগত যদি অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ দ্যাখেন, তাহলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে থাইরয়েড-এর সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

১১) যাদের সন্তান নিচু ক্লাসে পড়ে, সেইসব বাড়ন্ত বাচ্চাদের কড়া নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখবেন না। অত্যধিক নিয়মের বাঁধনে রাখলে তাদের জীবন থেকে আনন্দ-উচ্ছলতা ভাবটা চলে যাবে। একে তার জীবনযাত্রা হয়ে উঠবে যান্ত্রিক আর মৃত্যু ঘটবে তার সৃজনশীল মনের।

১২) সন্তানের শিক্ষাকে কখনোই স্কুলপাঠ্যে সীমিত করে রাখবেন না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আছে, অবসর সময়ে তা পাঠে ছেলে-মেয়েকে উৎসাহিত করুন। ছোট শিশুদের টেলিভিশনের পর্দায় ডিসকভারি চ্যানেল, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল ইত্যাদি শিক্ষামূলক চ্যানেল দেখিয়ে তাদের জ্ঞানপিপাসাকে বাড়াতে সাহায্য করুন।

১৩) অনেক বাবা-মা কে দেখা যায় বাড়ন্ত বাচ্চাদের নিয়ে একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগে যান – লেখাপড়ার পাশাপাশি নাচ, গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, ক্রিকেট, ক্যারাটে ইত্যাদি শেখাতে। এতগুলো দিকে বাচ্চার আগ্রহ থাকা কোনোমতে

সম্ভব নয়। আগ্রহ না থাকলে কোনোকিছু জোর করে চাপিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হবে, সন্তানের পড়াশোনাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

১৪) বাবা-মা ও বাড়ীর অন্যান্য গুরুজনদের সাথে ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক যেন মধুর ও আনন্দময় হয়। ডিনার টেবিলে বাড়ীর সবাই একসঙ্গে খেতে বসুন। সেখানে সন্তানের পড়াশুনা বা হোমটাস্ক নিয়ে কথাবার্তা না বলে অন্য নানান হালকা বিষয় নিয়ে কথা বলুন।

১৫) অনেক সময় দেখা যায় চাকরীজীবি বাবারা সন্তানের জন্যে একদম সময় দেন না। মনে করেন, সংসারে শুধু টাকা জুগিয়ে গেলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। কিন্তু বাস্তবে সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে পিতার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। ছেলে-মেয়ের খাওয়া-দাওয়া, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সামর্থ্যমত তাদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়া যেমন মায়েদের কাজ, তেমনি বাবাকেও সন্তানের সাথে খেলাধূলা করা, তাদেরকে সময়ানুবর্তিতা শেখানো, যতটা সম্ভব তাদের আগ্রহের বিষয়-সম্বলিত বই কিনে দেওয়া বা একসাথে বসে কম্পিউটারে কাজ করা ইত্যাদি ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে করতে হবে।

১৬) বয়স অনুযায়ী সন্তানের কিছু নির্দিষ্ট ইচ্ছা, আকাঙ্খা বা চাইবার জিনিস থাকে – জেনে-বুঝে অকারণে সন্তানের চাওয়াকে অবজ্ঞা করলে, তারা স্নেহ ভালোবাসাহীন হয়ে পিতা-মাতার থেকে দূরে সরে যায়। সন্তানের সাথে পিতা-মাতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তাদের শিক্ষাজীবনের জন্যে তাই অত্যন্ত জরুরী।

১৭) সন্তান দুষ্টুমি করে বলে অনেক বাবা-মা রীতিমত তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেন, নির্যাতন করেন, যাকে মাত্রাছাড়া শাসন বলা যায়। ছোট বয়সের চঞ্চলতা-দুষ্টুমি, মনে রাখতে হবে, অতি স্বাভাবিক ঘটনা – যা ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশের জন্যে জরুরী। তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে উপলব্ধি না করতে পারলে, সবসময় তাদের উচ্ছাসকে অবদমন করলে, তাদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ব্যহত হবে।

১৮) বিভিন্ন রকম খেলাধূলায় সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয়। এতে মনের সৃজন-ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি বাড়ে। দৈহিক পুষ্টির পাশাপাশি মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকে। তাই সকল অভিভাবকগণের উচিত বয়সোপযোগী খেলাধূলায় সন্তানকে উৎসাহিত করা।

১৯) আমাদের ছোটবেলাকার ঘুমপাড়ানি ছড়া বা ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলো আমরা আজও ভুলি নি। সুরে ও ছন্দে শেখা জিনিস ভালোভাবে মনে গেঁথে যায়। বাবা-মা যদি সন্তানকে আবৃত্তি শিখতে উৎসাহিত করেন, তবে তা পাঠ্যবিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্মৃতি-সহায়ক হবে।

২০) নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে পাঠরত সন্তানকে অভিভাবকগণ যদি নিকটবর্তী শিশু-উদ্যানে নিয়ে যান, এতে সেখানে সে অন্য অনেক শিশুর সাথে মেশার ও খেলার সুযোগ পাবে। এদের সন্তানের মন উদার হবে, তার মনের বিকাশ হবে ও তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠবে।

২১) সন্তানের লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা আনার জন্যে বাড়ীতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। নির্জন পড়ার ঘর, আলো-বাতাসযুক্ত পরিবেশ পাঠে মনোযোগ আনয়নের জন্যে জরুরী। আপনার ছেলে বা মেয়ে যে ঘরে পড়ছে, তার পাশের ঘরে বসে টিভি-মিউজিক সিস্টেম ইত্যাদি চালালে তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত হতে পারে।

২২) বাল্যকালে বা কৈশোরে কিছু ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করতে হবে। যেমন, যখন-তখন কোল্ড ড্রিংক্স খাওয়া, বেশী বেশী মিষ্টি খাওয়া, বাড়ীর বাইরে গিয়ে নানারকম ভাজা খাবার খাওয়া, মদ বা সিগারেট তো নৈব নৈব চ। সিগারেটের মধ্যেকার নিকোটিন ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

২৩) হৃদয় মনে আনন্দ-স্ফূর্তি বজায় রাখতে শখের জিনিস নিজে হাতে কেনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সন্তানের অতিরিক্ত আব্দার যেন অভিভাবকদের কাছে প্রশ্রয় না পায়। কখন কিভাবে কতটা খরচ করতে হবে তা যথাযথভাবে শিখিয়ে দিয়ে, আপনি সামর্থ্য অনুযায়ী কিশোর পুত্র বা কিশোরী কন্যার হাতে পকেট মানি দিতে পারেন।

২৪) আপনার সন্তান যদি অচেনা মানুষজনের সাথে কথা বলতে চায় বা বন্ধুদের বাড়ীতে যাতায়াত করতে চায় – তাকে বাধা দেবেন না। তবে খেয়াল রাখবেন যেন অপরিচিত কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে। সবার সাথে মিশে কে ভালো আর কে মন্দ তা যাচাই করে নিতে দিন। কৈশোর বয়সীদের জন্যে সব সিদ্ধান্ত পিতা-মাতার নেওয়া উচিত নয়।

২৫) অপ্রাপ্তবয়স্ক একটি ছেলে বা মেয়ে কোনো একটা অন্যায় করে ফেলতেই পারে। শুধু সেজন্যেই তাকে মন্দ ছেলে বা মেয়ে বলে কলঙ্কিত করবেন না। বাড়ীর কোনো সদস্য যেন তার সাথে দুর্ব্যবহার না করে, তার সম্পর্কে আজে-বাজে মন্তব্য না করে। তার সেই অন্যায়ের জন্যে বাবা-মায়ের রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে সহনশীল হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সন্তানের চরিত্রগঠনের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে।

জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি

Chapter -- 28

ছাত্রজীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি

১) তোমার যদি স্বপ্ন থাকে জীবনে বড়ো হবে, তাহলে ছাত্রজীবন থেকে তার প্রস্তুতি নিতে হবে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে সারা বছর ধরে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। কিন্তু শুধু বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখলে তো আর পড়াশোনায় সাফল্য আসবে না, সেইসব স্বপ্ন পূরণের জন্যে আদা-জল খেয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

২) যদি তুমি নিয়মানুবর্তী না হও তাহলে নিজের উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আর নিজের উপর কন্ট্রোল না থাকলে পাঠে মন বসাতে পারবে না। মানসিক এই অস্থিরতার জন্যে লেখাপড়া থেকে তোমার মনঃসংযোগ বিচ্যুত হয়ে যাবে।

৩) ইচ্ছাশক্তির জোরেই অনেক মানুষ অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছাটাই তোমাকে তৎসংক্রান্ত কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করবে। দুর্বল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, মনে রাখবে, জীবনে কোনো মহৎ সাফল্য পাওয়া যায় না।

৪) তোমার পরিশ্রমের বিনিময়ে তুমি যা পেলে সেটাই কেবলমাত্র তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নয়, বরং সৎ ও নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করতে করতে তুমি যে সব গুণগুলো অর্জন করবে সেগুলোই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয় হবে। তমি এমন কাজ করো, এমন আচরণ করো বা এমন লেখাপড়া করো, যেন সবাই তোমাকে গুড-বয় বলে।

৫) লেখাপড়ার প্রতি যদি তোমার উৎসাহ প্রবল থাকে আর যদি তুমি প্রকৃত উদ্যমী হও, তাহলে সাফল্যকে কেউ তোমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

৬) শুধুমাত্রপরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাটাই ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, জীবনে তোমাকে প্রকৃত ভালো মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। চরিত্র গঠনের জন্যে তাই দরকার নিরন্তর মূল্যবোধের চর্চা। তোমার জীবনের মরাল ও এথিক্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড যদি উচ্চমানের না নয়, তবে কেমন করে তুমি মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে?

৭) ছাত্রজীবনে সাফল্যের খিদে নিরন্তর জাগিয়ে রাখো অন্তরে। কাঙ্খিত সফলতা পাবার ব্যাপারে যদি তোমার বিশ্বাসের ভিত মজবুত থাকে, তবে সেটাই তোমার উৎসাহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। উনুনের আগুনকে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে হলে যেমন নিরন্তর কয়লা দিয়ে যেতে হয়, ছাত্র জীবনে পড়াশোনায় সাফল্য পেতে হলে তেমনি নিজের মোটিভেশনকে জাগ্রত রাখতে হয়।

৮) তোমার পড়াশোনার প্রস্তুতিতে যদি ফাঁকি থাকে, তাহলে তার প্রভাব তোমার রেজাল্টের উপর পড়বে। জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে, কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা নিয়ে তুমি যদি লেখাপড়া করো তোমার সাফল্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৯) একজন আদর্শ শিক্ষক মহাশয়ের সংস্পর্শে থাকলে তোমার লেখাপড়ার মান উন্নত হবে। তিনি তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবেন। একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক তোমাকে পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাও দেবেন।

১০) তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট যদি ভালো না হয়ে থাকে, তাহলে মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে নুতন উদ্যমে পরবর্তী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হও। সবসময় গঠনমূলক চিন্তা করতে শেখো, আর জোর দাও পজিটিভ বিলিভিং-এর উপর। দেখা গেছে, নিচু ক্লাশে যে ছেলেটি বরাবর খারাপ রেজাল্ট করে এসেছে, মনের জোরে নেতিবাচক সবকিছুকে বদলে ফেলে সে মাধ্যমিকে বা উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছে। মনে রেখো, খারাপ সময় সবসময় থাকে না। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে নিশ্চয়ই আলোর দেখা মেলে।

১১) স্কুলে-বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে সর্বত্র একনিষ্ঠ ছাত্রের মত শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হও। ভালো পড়াশোনা করতে পারার জন্য নিজের মধ্যে এমন একধরণের গর্ববোধ গড়ে তোলো, যা তোমার পরবর্তী সাফল্য-প্রাপ্তির জন্যে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু সেই গর্ববোধ যেন আত্ম-সর্বস্ব অহংবোধে রূপান্তরিত না হয়।

১২)সব ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি ও মেধা সমমানের হবে না। তোমার যা আছে তাই নিয়েই তুমি সফলতার মুখ দেখতে পারো, যদি তুমি মূল্যবান সময় নষ্ট না করে পরিশ্রমের বিনিময়ে তোমার যাবতীয় ঘাটতি পুষিয়ে দিতে পারো। আই-কিউ-এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনে সফল হবার মানসিকতা তৈরি করা।

১৩) ছাত্রজীবনে তুমি যদি বারো-চোদ্দো ঘণ্টা পড়াশোনার অভ্যাস করতে পারো, কে তোমার সাফল্য আটকায়? খুব ভোরে উঠে পড়ার অভ্যেস করো, প্রয়োজনমত মাঝরাতে জেগে পড়াশোনা করো, ক্লাশের অন্যান্য ভালো ছেলে-মেয়েদের সাথে সময় সুযোগ করে পাঠ্যবিষয় চর্চা করো, মোটকথা সাফল্যকে তোমার বরাবরের অভ্যাসে পরিণত করো, দেখবে তোমার ভবিষ্যত জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

১৪) তোমার থেকে উঁচু ক্লাশের যেসব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাজীবনে বৃহত্তর সাফল্য পেয়েছে, তাদের কাছ থেকে জেনে নাও সাফল্যের মন্ত্র। যারা ছাত্রজীবনে নিজেরাই ব্যর্থ, তারা তোমাকে কি করে শোনাবে সাফল্যের ফর্মূলা?

১৫) সমসময় চেষ্টা করবে স্কুলের সহপাঠী ও শিক্ষকমহাশয়দের কাছে নিজের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখতে। ধর্মগত বা অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ কোনো সহপাঠীকে ঘৃণার চোখে দেখবে না, কোনো কারণে তোমার শিক্ষকমহাশয়দের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে না, এসব হল ছোটো মনের পরিচায়ক।

১৬) আমরা যা ভাবি আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্বন্ধে, তাই-ই আমরা অন্যদের বলি। আমরা অন্যদের যা বলি, তাই-ই আমরা কাজে করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা যে কাজই করি না কেন, যেন তা আমাদের ভালো অভ্যাসকে প্রতিফলিত করে। আর তুমি যদি গঠনমূলক অভ্যাসের চর্চা করো, তবেই তোমার চরিত্র সৎ ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি হয়ে গড়ে উঠবে। মনে রাখবে, এই চরিত্রই তোমার সাত রাজার ধন মানিকরতন, যা তোমাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেবে।

১৭) এমন করে লেখাপড়া করো যেন উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারো, এবং সেই অর্জিত প্রকৃত শিক্ষা তোমাকে মানুষের মত মানুষ করে তোলে। তোমার জ্ঞানের আলো যেন সমাজের অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। কেবলমাত্র নিজের ভালো কাজের গুণেই মানুষ মৃত্যুর পরেও চিরদিন বেঁচে থাকে। সর্বদা তুমি নিজের ভালোর জন্যে, সমাজের দেশের ভালোর জন্যে, সর্বোপরি সভ্যতার অগ্রগতির কথা চিন্তা করবে, কিন্তু জীবন-যাপন করবে অতি সাধারণভাবে।

১৮) আমরা কেউ জ্ঞানকে সৃষ্টি করি না, প্রত্যেক মানুষ তার আত্মার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। তুমি যদি অধ্যাবসায়ী না হও, জ্ঞান তোমার কাছে ধরা দেবে না। সাফল্যলাভের ক্ষিদে যদি সহজাতভাবে তোমার মধ্যে না থাকে, তোমার শিক্ষালাভের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি তোমার স্বচ্ছ উপলব্ধি না থাকে, আর সাফল্য অর্জনের অনুপ্রেরণা যদি না তোমার দুর্বার না হয়, তোমার জ্ঞান-অর্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯) মানসিক ইচ্ছাশক্তির জোর বাড়াও সমস্ত নেগেটিভ ক্রিটিসিজম-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তোমার সাফল্য পাবার বাসনা যত বড়ো হবে, ততই তোমার বড়ো সফলতা পাবার সম্ভাবনা তৈরি হবে। আর নিজেকে সর্বদা বোঝাও তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবে, শিক্ষাজীবনের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি তুমি সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে। এই ধরণের অটো সাজেশন (auto-suggestions) আমাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং সেল্ফ-ফুলফিলিং প্রফেসি-তে পরিণত হয়।

২০) সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু মহান সৃষ্টি তার সবই সম্ভব হয়েছে সৃজনশীল মানুষদের জন্য। তোমরা তোমাদের চারপাশে এমন দু-একজন নমস্য মানুষ পাবে, যাঁরা তোমাদের আইডিয়া দেবেন কেমন করে নতুন নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হতে হয়। আজ আমাদের সমাজের কঠিন অসুখ— ভালো ডাক্তার হয়ে তোমাদের এই অসুখ সারাতে হবে। দার্শনিক সাহিত্যিক কিংবা বিজ্ঞানী হয়ে দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২১) তোমরা যারা ভালো রেজাল্ট করার জন্যে কঠোর তপস্যা করবে, একমাত্র তাদেরকেই মা সরস্বতী কৃপা করবেন ও আশীর্বাদ দেবেন। ঈশ্বর কেবল ভালোদের ভালোবাসেন, পরিশ্রমীদের পুরস্কৃত করেন। ভাগ্যের হাতে কখনোই তোমার সাফল্যকে ছেড়ে দিও না। মনে রেখো, বাবা-মা তোমার জন্যে অনেক অনেক আত্মত্যাগ করছেন, স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমহাশয়গণ তোমাকে আদর্শবোধ শেখাচ্ছেন ও জ্ঞানদীক্ষা দিচ্ছেন। এঁরা সবাই অনেক আশা নিয়ে তোমার লেখাপড়ায় সাফল্যের দিকে তাকিয়ে আছেন, তোমরা কেউ এঁদের নিরাশ কোরো না।

২২) অতীতের যে ভুলের জন্যে তুমি শিক্ষাজীবনে আশানুরূপ সাফল্য পাওনি, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সাফল্যের সিঁড়িতে চড়ার জন্যে এগিয়ে চলো। কোনো ব্যর্থতাতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে নেই; বরং ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে শিখতে হবে। ভালো ছেলে-মেয়েরা শুধু তাঁদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না, অন্যদের ভুল থেকেও নিজেরা শিক্ষা নেয় এবং সাফল্যের শীর্ষে চড়ে বসে।

২৩) আজ যদি না তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করার সিদ্ধান্ত নাও, ভবিষ্যতে তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। স্বর্নিভর হয়ে সমাজে তুমি প্রতিষ্ঠা যদি পেতে চাও, হচ্ছে হবে এই মনোভাব ত্যাগ করে ভালো রেজাল্ট করার জন্যে প্রাণপাত করো। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ড উচ্চমার্গের তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অযথা কালবিলম্ব করে না।

২৪) তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবে, এই বিশ্বাসের শক্তিই তোমাকে উদ্যমী ও লেখাপড়ায় পরিশ্রমী করে তুলবে। উনুনের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হলে যেমন একের পর এক জ্বালানি দিতে হয়, সাফল্যের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তেমনি উৎসাহ-উদ্যমকে তুঙ্গে রাখতে হয়। আর নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে সবসময় তুমি অনেক ভালো ভালো উদাহরণ তোমার চারপাশে পাবে। মহৎ লোকেদের জীবনী অনুসরণ করে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লে, তুমিও একদিন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে।

২৫) সাফল্য কোনো বাঁধা ছকে আসে না। শুধু কতকগুলো নিয়মকানুন অন্ধের মত অনুসরণ করে গেলেও সাফল্যের চূড়ায় ওঠা যায় না। সাফল্যের পথে অনেক কাঁটা বিছানো থাকে, অনেক উত্থান-পতন থাকে, শুধু কতকগুলো ফর্মুলা মেনে তাই সাফল্যকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের তাই শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে ভালোবাসতে হবে, জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আনন্দের সাথে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। নিজের জীবনীশক্তির সমস্ত নির্যাস তোমরা নৈবেদ্য হিসাবে সাফল্যের জন্যে উৎসর্গ করে দাও।

Chapter -- 29

কোন্ পথে প্রকৃত সাফল্য আসে

জীবনে সাফল্য পেতে হলে অনেক ছোটখাটো ব্যর্থতাকে সফলভাবে অতিক্রম করতে হয়। জীবন-যুদ্ধে সাফল্য মানে চরম যুদ্ধজয়কে বোঝায়, প্রত্যেক লড়াই জেতাকে বোঝায় না। এক যুবক একুশ বছর বয়সে একটা বিজনেস করে অসফল হয়েছিলেন। ২২ বছর বয়সে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-র ভোটে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। ২৪ বছর বয়সে আবার একটা বিজনেস করে, আবার লস্ খেয়েছিলেন। ২৬ বছর বয়সে তাঁর প্রণয়িনীর মৃত্যু তাঁর জীবনকে হতাশাময় করে তুলেছিল। ২৭ বছর বয়সে তিনি স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ৩৪ বছর বয়সে মার্কিন কংগ্রেসের ভোটে দাঁড়িয়ে আবারো পরাজয় বরণ করেছিলেন। ৪৭ বছর বয়সে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। ৪৯ বছর বয়সে আবার একবার সিনেট-এর নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যথারীতি পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ৫২ বছর বয়সে ইউনাইটেড স্টেটস-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ তিনিই। বলুন তো কে এই মহান ব্যক্তিত্ব? — আমেরিকার জাতির জনক — আব্রাহাম লিঙ্কন। তাঁকে কি আপনি ব্যর্থ মানুষ বলবেন? এত পরাজয়ের গ্লানিতে তিনি তো হাল ছেড়ে দিতে পারতেন। তিনি মনে করতেন, ব্যর্থতা জীবনের এক-একটা বাঁক মাত্র, অন্ধগলি নয়। তাহলে আমরা দেখলাম, সফল লোকেরা অসামান্য কাজ করে না; তাঁরা সামান্য কাজ অসামান্যভাবে করে। আপনি একজন ক্রিড়াবিদ বা যে কোনো খেলার কোচকে জিজ্ঞেস করুন— একটা ভালো টিম আর একটা খারাপ টিমের মধ্যে পার্থক্য কি? — তিনি বলবেন ঃ তাঁদের শারীরিক গঠন, নৈপুণ্য এবং প্রতিভাতে খুব বেশি পার্থক্য নেই। আপনি ভালো টিমের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে গুণটা দেখবেন, সেটা হল তাঁদের আবেগ-গত উৎকর্ষতা — জয়ের উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করা এবং অতিরিক্ত প্রচেষ্টা। কোন একটা ক্লাশের দু'জন ছাত্রের মধ্যে একজন ফেল করলো, আর একজন পাস করলো। একই বই, একই সিলেবাস, একই টিচার, দুজনেই সারা বছর পড়াশুনা করেছে— তাহলে একজন ফেল করলো কেন? সহজ উত্তর। অতিরিক্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ করেনি।

পৃথিবীতে ভালো করবার ভার যখন কেউ নিজের উপর নিয়েছেন, চিরদিনই তাঁর শত্রু সংখ্যা বেড়েছে। সেই ভয়ে যাঁরা পিছিয়ে দাঁড়ান, আপনিও তাঁদের দলে গিয়ে যদি মেশেন— তাহলে চলবে কি করে? ডিমে তা দিলে তবে ডিম ফুটে বাচ্চা জন্ম নেয়; বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না— মরে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবনের চলার পথকে তাই মসৃণ করে নিতে হয়। একজন জীবন-বিজ্ঞানের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শেখাচ্ছিলেন — শুঁয়োপোকা থেকে কিভাবে প্রজাপতিতে রূপান্তর ঘটে। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের বললেন— আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুটি ভেঙে প্রজাপতি বেরিয়ে আসবে। প্রজাপতিটা যখন বেরোনোর জন্যে ছটফট করবে, তখন তোমরা কেউ ওকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনোরকম সাহায্য করবে না। বলে, তিনি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছাত্ররা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল— কখন পোকাটি গুটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। একটু পরেই কাঙ্খিত মুহূর্তটি এসে গেল। প্রজাপতিটা গুটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই সে সফল হতে পারছিল না। কিছুক্ষণ দেখার পর ছাত্রদের মধ্যে একজনের খুব দয়া হল। সে ভাবলো, প্রজাপতিটাকে বেরিয়ে আসার জন্যে সে সাহায্য করবে। শিক্ষক মহাশয়ের আদেশকে অগ্রাহ্য করে দয়াপরবশ ছাত্রটি গুটির মুখটা একটু কেটে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রঙীন প্রজাপতিটা মাটিতে পড়লো কিন্তু একটু পরেই সে মরে গেল। শিক্ষকমহাশয় ফিরে এসে যা ঘটেছিল, সব শুনলেন। তারপর তিনি ছাত্রদের বোঝালেন তোমাদের সাহায্যই প্রজাপতিটার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কেননা, গুটি থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম করার প্রক্রিয়াতেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রজাপতিটার গা থেকে লালা ঝরে যেত এবং সে ওড়ার জন্যে তার ডানায় শক্তি সঞ্চয় করতো। এবং তারপর সে বেরিয়ে এসে উড়ে চলে যেত। তোমরা অযাচিতভাবে প্রজাপতিটার উপকার করতে গিয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালে। আমাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। জীবনের প্রত্যেকটা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্যে নিজের মধ্যে চাই আত্মশক্তির উন্মোচন। হতাশ হয়ে বসে না থেকে প্রত্যেক মানুষেরই ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিৎ। প্রথমে যা করা দরকার বলে মনে করেন আপনি তাই করুন, তারপর যা করা সম্ভব তাই করুন— হঠাৎ আপনি দেখবেন আপনি অসাধ্য-সাধন করে ফেলেছেন। আমি মনে করি— জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। জীবনের সুস্পষ্টতাই আপনার জীবনের সফলতা। যাকে আমরা দুঃখের মধ্যে দিয়ে কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে বরণ করে নেয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবার জন্যে সবাই যে সাধনা করছে, আপনি তার থেকে একটু বেশি অতিরিক্ত মনোনিবেশ দিন — সাফল্য

আপনার হাতের মুঠোয়। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর বিশ্বাস করতে শিখুন। যাঁরা সবগুলো ব্যবহার করেন, তাঁরা মহামানব— নমস্য, শ্রদ্ধার্হ, প্রণম্য, প্রাতঃস্মরণীয়। সাধারণ মানুষের সাথে সেই সমস্ত পুণ্যাত্মাদের তফাৎ কি জানেন? গুনতিতে তাঁরা একটা-দুটো, আমরা অনেক।

মানুষের মন যা কল্পনা করে এবং বিশ্বাস করে — নিষ্ঠার সাথে সম্পাদিত সেই কর্মের দ্বারা সে তা অর্জন করে। নিজের ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হবে, আত্মশক্তির তত বিকাশ হবে। অপর ব্যক্তির কোলে পিঠে চড়ে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে কোনো মাহাত্ম নেই, কারণ, চলবার শক্তি-লাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়া মাত্রই লাভ নয়। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হলে তবেই মানুষের মধ্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। আমরা জানি, পাওয়া জিনিসে বিতৃষ্ণা না জন্মালে— নতুন করে আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয় না। কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে উদগ্র বাসনা জীবনে সফলকাম হবার সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রেরণা। একজন সক্রেটিস্-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জীবনে সফলতার রহস্য কি?_ সক্রেটিস্ তাকে বলেছিলেন— কাল সকালে তুমি নদীর পাড়ে এসো — তোমাকে সব বলবো। পরদিন সকালে দুজনে নদীর ধার ধরে হাঁটছেন। হাঁটতে হাঁটতে সক্রেটিস্ ছেলেটিকে জলের উপর নিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে দুজনে নদীর আরো গভীরে নামতে লাগলেন। জল যখন দুজনের গলা পর্যন্ত উঠে এলো, আচমকা সক্রেটিস্ ছেলেটিকে জলের মধ্যে মাথা-শুদ্ধ চেপে ধরলেন। ছেলেটি জল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগল। সক্রেটিস্ ততোধিক জোরে তাকে চেপে ধরে রাখতে লাগলেন যতক্ষণ না ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে পাংশুটে হয়ে যায়। তারপর তিনি ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেন। সে দম ফুরিয়ে হাঁপাতে লাগল এবং হাঁ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। সক্রেটিস্ এবার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস্ করলেন — যখন তুমি জলের মধ্যে ছিলে, তখন তুমি সবচেয়ে বেশি কী পেতে চাইছিলেন? ছেলেটি উত্তর দিল — 'বাতাস'। সক্রেটিস্ বললেন — এটাই সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি। যখন যা আপনার দরকার, সেটাকেই যদি আপনি সর্বক্ষণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তবেই আপনি তা পাবেন। ভারত-পাকিস্তান ওয়ান-ডে ম্যাচের আগের দিন কি শচীন তেন্ডুলকর ফুটবল প্র্যাকটিস্ করে? আপনি সাফল্য চাইছেন যাতে — করছেন তার থেকে অন্য কিছু, কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি কখনোই আপনার হাতের মুঠোয় ধরা দেবে না। বিশ্বনাথন আনন্দ, কাসপারভ-এর সাথে খেলার আগের দিন কি বসে বসে লুডো খেলেন? খেলেন না। যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে আর যাদের শুধু ছাই জমা আছে— তাদের কর্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। মনে রাখবেন —সামান্য একটু আগুন যেমন প্রচণ্ড উত্তাপ দিতে পারে না, দুর্বল আকাঙ্ক্ষা তেমনি কোনো বৃহত্তর সাফল্য এনে দিতে পারে না। আমি বলি কি— দীর্ঘকাল ধরে ধোঁয়া ছাড়ার চেয়ে মুহূর্তের জন্যেও জ্বলে ওঠা ভালো। মূহুর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধুমায়িতং চিরম্।

একজন মানুষ জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাইলে কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে তাঁকে? প্রথমে, তাঁকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাবার জন্যে যা যা করণীয়— তা করার জন্যে দায়বদ্ধ হতে হবে। যখন আমরা জেতার জন্যে খেলতে নামি— তখন উৎসাহ-উদ্যম এবং গৃহীত দায়িত্ব পালনের প্রতি প্রতিশ্রুতি আমাদের চালিকা-শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন আমরা না হারার জন্যে খেলতে নামি — তখন আমাদের অবচেতন মনে মানসিক দুর্বলতার একটা জায়গা তৈরি হয়ে যায়। একটা নৌকা যদি মাঝ-নদীতে ঝড়ের সম্মুখীন হবার ভয়ে পারাপারের চেষ্টা না করে, তাহলে দিনের পর দিন অব্যবহারের ফলে ঘুন লেগে নৌকাটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঘুন লেগে, মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবার জন্যে তো আর নৌকা বানানো হয় না—ঝড়কে চ্যালেঞ্জ করে নদী পেরোনোতেই তার সার্থকতা। আমাদের সমাজেও কিছু লোক আছে — যারা হেরে যাবার ভয়ে কখনোই চেষ্টা করে না। বলে— 'তাইতো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার/এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।' অলিম্পিকে কুস্তিতে গোল্ড মেডেলিস্ট, ড্যান গ্যাবেল বলেছিলেন — প্র্যাকটিস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যখন আমি থামার কথা ভাবি তখন আমি দেখে নিই, আমার পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী কোথায় কি করছে। যদি আমি দেখি, সে তখনও প্র্যাকটিস করে চলেছে— আমি তখন না থেমে আমার প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে থাকি। তারপর যখন দেখি— প্র্যাকটিস বন্ধ করে সে স্নানঘরে শাওয়ার-এর তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আমি আরো কঠিনভাবে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাই। মানুষ যত চায় ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা— তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় না থাকলে তাই প্রতিশ্রুতি পালন করা যায় না। আগে দেখে নিন অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তারপরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।

কমিটমেন্ট ছাড়া জীবনে সাফল্য পাবার জন্যে আর যা অবশ্যই দরকার; তা হল হার্ডওয়ার্ক। আমাদের জীবনযাত্রায় যা কিছু উপভোগ করি— তার সবই কারুর না কারুর কঠোর পরিশ্রমের ফসল। অসম্ভব ইচ্ছাশক্তি এবং সুকঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা ছাড়া অসাধারণ প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। অ্যানড্রু কারনেগি বলেছিলেন — আম-জনতা তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের ২৫ শতাংশ কাজে লাগায়, মাঝারি মাপের মানুষরা যদিও তাঁদের কর্মক্ষমতার ৫০ শতাংশ সদ্ব্যবহার করে, তথাপি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কখনো চরম লক্ষ্য অর্জন করা যায় না; কেবলমাত্র যাঁরা তাঁদের লক্ষ্যের প্রতি ১০০ শতাংশ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, জয়ের মুকুট ফলতঃ তাঁদের মাথায় পরানো হয়। আবার শুধু চেষ্টা থাকলেই কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়া যায় না। যথাসময়ে অন্তর্নিহিত

ক্ষমতার উদ্বোধন হওয়া চাই। বাড়ির ছাদের কোনায় বসে যদি আপনার মাথায় গাছ গজিয়েও যায়, তবু আপনি কালিদাসের মত আর একটা মেঘদূত লিখতে পারবেন না — মেঘ দেখে আপনার ঝড়-জলের আশঙ্কাই হবে। সর্দি লাগবার ভয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠবেন— বিরহীর দুঃখ ভাববার সময় পাবেন না। আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে পারি। হাঁস যখন পুকুরে জলের উপর চুপচাপ স্থির হয়ে ভাসে—তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্থির কিন্তু জলের মধ্যে নিরন্তর তার পা দুটো প্যাডেল করে চলেছে। প্রকৃতি পাখিদের জন্যে ফুল-ফলের অফুরন্ত অয়োজন করে রেখেছে কিন্তু কষ্ট করে তাদের পছন্দের খাবার দাবার বাসায় নিয়ে আসতে হয়। বড়ো বড়ো কথা বলার চেয়ে একটা ছোটো কাজ সুচারুভাবে সমাধা করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। আমরা জানি, প্যারাডাইস লস্ট লেখার জন্য মিলটন প্রতিদিন ভোরে ৪-টেয় উঠে পড়তেন। ওয়েবস্টার'স ডিকশনারি লিখতে নোয়া ওয়েবস্টার -এর ৩৬ বছর লেগেছিল। আজ সাধনাও নেই, সিদ্ধিও নেই। আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা, বীর্যের স্থলে অহংকার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করছে। শরদি গর্জতি ন বর্ষাতি, বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ। নীচো বদতি ন কুরুতে ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব। শরৎকালের মেঘ গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না। বর্ষাকালের মেঘের গর্জন নেই, কিন্তু বর্ষণ আছে। নীচ লোকে কথা দেয়, কিন্তু করে না। সুজন যে হয়, সে কাজই করে বেশি কথা বলে না।

কমিটমেণ্ট এবং হার্ডওয়ার্ক ছাড়া জীবন সফলকাম করার জন্য আর যা যা অবশ্যই দরকার, তা হল ডিজায়ার বা ইচ্ছাশক্তি, পজিটিভ বিলিভিং বা ইতিবাচক বিশ্বাস এবং ক্যারেকটর বা চরিত্র। এগুলো না থাকলে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে অ্যাকশন প্ল্যান, তা ফলদায়ী হয় না। চকমকি পাথর স্বভাবতঃ আলোকহীন, উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হলে তবে সেই অট্টহাস্যে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। কোনো কিছু করার ইচ্ছা যখন উদগ্র বাসনার দ্বারা চালিত হয় তখন তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তিই আপনার সাফল্যের সিঁড়িতে চড়ার সবচেয়ে পরম পাথেয়। শিশু মা-কে শুধায় — 'এলাম আমি কোথা থেকে?' মা উত্তর দেয়— 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' ইচ্ছার বাঁধন তাই শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে আমরা ইচ্ছার নাগপাশে যা দিয়ে বাঁধি তা হল আন্তরিক বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, যদি আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে চরম লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। বিশ্বাস না করলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। পথের দাবী উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন— বিশ্বাসই তো শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য আপনার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠবে। আবার কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোনো কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যুবরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে তাদের জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করছে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করে নি। অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং মূল্যবোধের শিক্ষাই যথার্থ বিশ্বাসের ভিতকে মজবুত করে। আর সেজন্য দরকার সঠিক চরিত্রগঠন। মানুষের জীবনে মহামূল্য রত্নের চেয়েও দামী এই নৈতিক চরিত্র অর্জন। আমাদের শৈশবাবস্থাতেই চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হয় এবং আমৃত্যু তাকে বিকশিত করে যেতে হয়। বাগানের মালী যেমন ফুলগাছকে রক্ষা করার জন্যে আগাছা নির্মুল করে, চরিত্র গঠন করার জন্যে তেমনি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতাকে সততার সাথে অতিক্রম করতে হবে। উন্নত নৈতিক চরিত্র হচ্ছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সৎসাহস, আত্মসম্মান, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং মানবিক মূল্যবোধের সমষ্টিগত সমাহার। চরিত্রের এই দিকগুলোর বিকাশ হলে, সে কখনো অজুহাত খাড়া করে না— সে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে গঠনমূলক শিক্ষা নেয়— সে নিজেকে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে তোলে — অন্যের ক্ষতি করে সে নিজের সমৃদ্ধি কামনা করে না — সৌজন্যবোধ, আত্ম-সংযম, চিত্তের উদারতা, আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জীবনকে সে মহাজীবনের দিকে চালিত করে। একটা ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে যেমন সূর্যের আলো দেখা যায়—এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণের সমাহারে তেমনি চরিত্রের বিকাশ সাধন হয়। অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ চ মধ্যমাঃ/ উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্। অধম লেকে ধন চায়, মধ্যম লেকে ধন ও মান দুইই চায় — আর উত্তম লোকে শুধু মানই চায়। মহৎ লোকের কাছে মানই ধন। চরিত্রই সেই সাত রাজার ধন মানিক রতন, যা আসলে মানুষের মন জয়ের একমাত্র চাবিকাঠি— ফলতঃ আপনার জীবনে সাফল্যের পূর্বশর্ত।

কমিটমেণ্ট, হার্ডওয়ার্ক, ডিজায়ার, পজিটিভ বিলিভিং এবং ক্যারেকটর ছাড়াও জীবনে সাফল্য পেতে হলে আরো কতকগুলো জিনিস দরকার। সেগুলো হল— যথাক্রমে, দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্জন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকার ক্ষমতা, জীবন আমাকে যা দেবে তার থেকে বেশী দেবার মানসিকতার অধিকারী হওয়া এবং নিজের কর্মকাণ্ডের প্রতি গর্ববোধ করা এবং সবশেষে যেটা দরকাব তা হলো সর্বক্ষণ অনুগত ছাত্রের মতো শেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখবেন, চরিত্রবান লোকেরা সদা-সর্বদা নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন থাকে। তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এবং নিজেদের সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করে। দায়িত্ব-সচেতন লোকেরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং তার থেকে ইতিবাচক শিক্ষা নেয়। আপনি যতটাকা রোজগার করেন, তার থেকে বেশী খরচ করে আপনি কখনোই ঋণমুক্ত থাকতে পারেন না। শ্রেণী-ঘৃণাকে উৎসাহিত করে কেউ কখনো সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

অন্যকে নিরুৎসাহিত করে এবং তার ন্যায্য স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে আপনি নিজের সাহস ও চরিত্র অর্জন করতে পারেন না। দুর্বলকে সবল করার জন্য সবলকে দুর্বল করার চেষ্টা তাই মুর্খামি। ধার করার টাকায় নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বাসনা অতএব নাবালোকোচিত। একজন মানুষ নিজের জন্য যা করতে পারতেন, আপনি তার জন্য সেটা করে দিয়ে চিরদিনের জন্য তাঁকে সাহায্য করতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরাই সভ্যতার পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক। বিরল এ সম্মান তাঁরা অর্জন করেছেন শত-সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্বেও নিজেদের দায়িত্ববোধের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে। আর এই নিষ্ঠার চর্চা সম্ভব নয় যদি না আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতেও অবিচল থাকার ক্ষমতা অর্জন করেন। কোনো একজন ক্রীড়াবিদ ১০০ মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য প্রত্যেকদিন ভোরে-সকালে-বিকালে কত ঘন্টা না প্র্যাক্টিস করে। কিন্তু ঐ দৌড় প্রতিযোগীতায় জেতার জন্য তার বড়োজোর মিনিটখানেক সময় লাগে। মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে— একটা প্রয়োজনের, আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। আমরা নিজের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করি না; আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে নিজেকে দেখার জন্যই আমরা আয়না ব্যবহার করি। মানুষ তাই অন্তরস্থিত শুভশক্তির জোরেই তার কাঙ্খিত সাফল্যকে ছিনিয়ে নিতে পারে। কখনো হীনমন্যতাকে স্থান দেবেন না মনে। আপনি যা আপনি তা-ই। সেজন্য সবসময় নিজেকে সম্মান দিন এবং আপনার কর্মজগতে সব কিছু আত্মমর্যাদার সাথে করুন। চায়ের কাপের যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততটাই তা প্রধান অংশ নয়,বস্তুতঃ সেটাই তার গৌণ; যতটা তার ফাঁক, ততটাই তার মুখ্য অংশ। ওই ফাঁকটাই চা বা কফিতে ভর্তি হয়, পোড়া চীনে মাটিটা উপলক্ষ্য মাত্র।

গাছের ফুল শুকাবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আপনি আমায় বলুন,অনেক লোক দারুন ইনটেলিজেন্ট ও বেশ দাগ কাটার মত অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন-এর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন সাফল্যের চূড়ায় উঠতে পারে না? মাঝারি মাপের মানুষ হিসাবে কেন তারা জীবন শেষ করে দেয়? কারনটা আর কিছুই নয়। কোন কাজ না করতে পারার পেছনে যে যুক্তিগুলো থাকে, নেগেটিভ এনার্জি হিসাবে তা ওই মানুষগুলোর সৃজনশীল মননক্রিয়াকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধিমত্তার চেয়ে বেশী দরকার এমন মানসিকতা গড়ে তোলা যার সাহায্যে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে জীবন থেকে আমাদের যা অর্জন, আমরা যেন তার থেকে বেশী সমাজকে প্রতিদান দিতে পারি। ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজে চলে না। সফল লোকেরা সাফল্য পাবার জন্যে যা যা করা উচিৎ, তাই করে এবং তার থেকেও কিছু বেশি। সফল লোকেরা দায়িত্ব সচেতনভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে এবং তার থেকেও কিছু বেশি। সফল লোকেরা উদার এবং সৌজন্যবোধ-সম্পন্ন হয় এবং তার থেকেও কিছু বেশি। সফল লোকেরা তাদের সামর্থ্যের ১০০ শতাংশ সদ্ব্যবহার করে এবং অবশ্যই তার থেকে কিছু বেশি। একটা বিশেষ ক্ষেত্র আছে— যেখানে পৌঁছালে সাফল্য আর আকাশের চাঁদে থাকে না, মনে হয় যেন ছেলের হাতের মোয়া। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে জীবনের পথে আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছি— জীবনের বিশেষ একটা বাঁকে এসে আমরা সবাই হাঁপিয়ে পড়ি। তার পরের রাস্তাটুকু যদি আপনি দম রেখে দৌড়তে পারেন, সেখানে আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই— ফলতঃ আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন। যারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার চেষ্টা করে, তাদের মাথাটা হয়তো বেঁচে যায়, কিন্তু মুখটা তাদের কাঁঠালের আঠায় আচ্ছামতন আটকে যায়। মনে রাখবেন, আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি লাভ করা যায়। কিন্তু আত্মোপলব্ধি বলতে কামনা-বাসনা বর্জনকে বোঝা না; কামনা-বাসনার মধ্যে সঙ্গতি সাধন করে ব্যক্তির আত্মার সামগ্রিক বিকাশসাধনই হল পূর্ণতা বা সাফল্যলাভ। যাদের বদন প্রসন্ন, হৃদয় দয়ায় পূর্ণ, যাঁদের মুখে সুধা-ভরা কথা, যাঁদের কাজ পরোপকার করা— কে না তাঁদের সম্মান করে?

সফল হবার জন্য আপনার ডিজায়ার খুব স্ট্রং। সাফল্য যে আপনি পাবেনই— এ ব্যাপারে আপনার ইতিবাচক বিশ্বাসের ভিত খুব মজবুত। জীবনে সফল হতে গেলে যে কঠোর পরিশ্রম করা দরকার তা করার জন্যে আপনি কমিটমেন্ট করেছেন। সমুন্নত বিবেকবোধ আপনার নৈতিক চরিত্রকে চালিত করে। সাফল্য না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কাজে ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকার মানসিকতা অর্জন করেছেন। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনি অবিচল থাকতে শিখেছেন। নিজের কর্মপ্রক্রিয়ার প্রতি আপনার গর্ববোধ আছে। এবার যদি আপনি একজন উপযুক্ত শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র হতে পারেন— তাহলে আপনি হাতে আলাদিনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ পেয়ে গেলেন, শুধু বলুন 'চিচিং ফাঁক'।

ধরুণ একজন ছাত্রের সামনে ঈশ্বর এবং তার শিক্ষাগুরু দাঁড়িয়ে রয়েছেন — ছাত্র কাকে প্রথমে প্রণাম করবে? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির শিষ্ঠাচার হচ্ছে ঃ ছাত্রটি তার শিক্ষাগুরুকে আগে প্রণাম করবে— কারণ, গুরুর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে তবেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করেছে। উদ্দেশ্যের চেয়ে উদ্দেশ্যের বাধাটি বেশি করে প্রকট হয় বলে—কেউ যখন নতুন সাইকেল চড়া শেখে তখন যে যতটা না চড়ে, তার চেয়ে বেশি পড়ে। উদ্দেশ্যের বাধা কাটিয়ে স্বপ্নপূরণের জন্যে তাই

যোগ্য শিক্ষাগুরুর কোনো বিকল্প নেই। অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নেই, রসবোধের মধ্যে আছে। এই জন্যে যারা সেটাকে খোঁজে তারা সেটাকে পায় না। সেইজন্যে আনন্দের ভোজে বাইরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— এটা আমাদের গুরুর কাছে শিখতে হয়। জ্ঞানচর্চা যার যথার্থ, সে ভালো কাজে জিতে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আসলে, মন্দ তো ভালোর শত্রু নয় — ভালোর শত্রু তার চেয়ে যে আরো ভালো সে, সেই আরও ভালো যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তার হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে সাধারণ ভালোকে সরে যেতে হবে। আমরা জানি, ভ্রমর যেমন নানা ফুল হতে মধু সংগ্রহ করে — কুশল লোকে তেমনি ছোট-বড়ো সকল শাস্ত্র হতে জ্ঞান আহরণ করে। আমাদের দেহের শুদ্ধি হয় জল দিয়ে, মনের শুদ্ধি হয় সত্য দিয়ে, জীবাত্মা শুদ্ধ হয় বিদ্যা আর তপস্যা দিয়ে আর বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে। এ ব্যাপারে 'পার্সোন্যালিটি উইণ্ডো থিওরি' খুবই ফলপ্রসু হতে পারে। এক, আপনার সম্পর্কে এখন কিছু তথ্য আছে যা আপনি নিজে জানেন এবং অন্যেরা অনেকেই জানে — যেমন আপনার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি। দুই, আপনার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য আছে যা আপনি জানেন কিন্তু অন্যেরা জানে না — যেমন আপনার বয়স, ইনকাম, একস-গার্লফ্রেণ্ড ইত্যাদি। তিন, আপনার সম্পর্কে এখন কিছু তথ্য আছে যা আপনি জানেন না কিন্তু অন্যেরা জানে — যেমন আপনার বডি অডর, ব্যাড ব্রেথ, ফল্টি টকিং হ্যাবিট ইত্যাদি। চার, আপনার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য আছে যা আপনিও জানেন না, অন্য কেউ জানে না —তো, জো আপ নেহী জানতে হ্যাঁয়, ও আপ খুদকো শিখা নেহী পাতে হ্যাঁয়। চেয়ারের উপর বসে আপনি চেয়ারটা উপরে তুলতে পারবেন না। যতই বলি না কেন, শিক্ষকটাকে যতদূর পারি উঁচুতে রাখব — কায়দাটাকে আমাদের মতো করতে দিন, সে কথায় কেউ কান দেয় না। বলে কিনা, ওই কায়দাটাই তো শিক্ষা। মনের মিলন বা কি, আর শিক্ষার মিলন বা কি — সে কেবল হতে পারে সামনে সামনে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। না হলে সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে — তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, মানুষকে সে শুধু হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনোদিন মনুষ্যত্ব দেবে না। কোনো বিষয় সম্পর্কে যে জানে না এবং জানে না যে সে সেটা জানে না — সেই ইচ্ছে বোকা — তার সংসর্গ ত্যাগ করুন। কোনো বিষয় সম্পর্কে যে জানে না কিন্তু জানে যে সে সেটা জানে না — সে সুতরাং জানতে চায়, তাকে শেখান। কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে কিন্তু সে জানে না যে সে সেটা জানে তার প্রতিভা সুপ্ত আছে, উপযুক্ত গুরুই তার ভিতরের ক্ষমতাকে জাগিয়ে দিতে পারে। কোনো বিষয় সম্পর্কে যে জানে এবং সে জানে যে সে সেটা জানে—সেই প্রকৃত জ্ঞানী সাধু — নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর কাছে শিক্ষা নিন। তিনি আপনাকে শেখাবেন— হারার জন্যে নয়, জেতার জন্যে খেলায় নামতে হয়। অন্য লোকের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়। সবসময় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষজনের সাথে মেলামেশা করতে হয়। তিনিই আপনাকে শেখাবেন — বড়ো কিছু পেতে গেলে তার জন্যে প্রাপ্য মূল্য দিতে হয়। নিজের অন্তরস্থিত শক্তির মূল্যায়ন করতে করতে সাফল্যের সিঁড়িতে চড়তে হয়। যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সুদূরপ্রসারী প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হয়।

তাই আর কথা নয়, শুধু কাজ। আর বসে থাকা নয়, শুধু এগিয়ে চলা। চলো, চলো। ঝরণার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। চল্ — চল্ — চল্ — উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল/নিম্নে উতলা ধরণী-তল / অরুণ প্রাতের তরুণ দল / চল্ রে — চল্ রে — চল্ ...

Chapter -- 30

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে

১. যে পাঠ্যবিষয় তোমার মনে রাখতে হবে, দিনের কোনো এক সময় পড়ার পরে তার সংক্ষিপ্তসার একটুকরো কাগজে লিখে রাখো। রাত্রে শুতে যাবার আগে দু'-তিনবার সেটা জোরে জোরে আবৃত্তি করে তারপর রিল্যাকসড মুড -এ বিছানায় যাও।

২. যে বিষয় শিখতে হবে তার সাথে যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমন্বয় করতে পারো, তাহলে শিখতে তোমার সুবিধা হবে। স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, গতিশীলতা, অনুভূতি ও ছবির অনুষঙ্গে যদি তুমি শিখতে পারো, তা খুবই স্মৃতি-সহায়ক হবে।

৩. পাঠ্যবিষয়ের যে লাইনটা তুমি পড়ছো তার নিচে আঙুল বা পেনসিল দিয়ে পাঠক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে গেলে, তা শিখন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

৪. স্পিড রিডিং করার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাসা-ভাসা চোখ বুলিয়ে পাঠ্যবিষয়ের দরকারী অংশে মনঃসংযোগ করা হয়। বিশেষত, ইতিহাসের অনেক দীর্ঘ পাঠ সংক্ষিপ্তসার আকারে মনে রাখার জন্যে এই পদ্ধতি কার্যকরী।

৫. পড়ার সময় বাইরের জগতের বিবিধ আওয়াজ যেন তোমার মনকে প্রভাবিত না করে। পাশের ঘরের কথাবার্তা বা দূর থেকে মাইকে ভেসে আসা গানের আওয়াজ যেন তোমার মনকে পড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। পাঠ্যবিষয় অখণ্ড একাগ্রতায় পড়তে পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিষয় সহজেই মনে রাখতে পারবে।

৬. পাঠ্যবিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতা প্রসারিত করতে হলে ছাত্রাবস্থা থেকেই ধ্যান অভ্যাস করা দরকার। প্রথিতযশা শিক্ষবিদরা মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে যোগব্যায়াম চর্চার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

৭. বাইরের অন্য সবকিছুর প্রভাব থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ্যবিষয়ে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করার অভ্যাস করো। এক বিষয় পড়ার সময় কখনোই অন্য বিষয়ের চিন্তা মাথায় এনো না।

৮. উজ্জ্বল আলোর সামনে বই রেখে পড়লে মনোযোগের তীব্রতা বাড়ে। আস্তে না পড়ে উচ্চৈঃস্বরে পড়লে পাঠ্যবস্তুর প্রতি মেন্টাল ইনভলবমেন্ট বাড়ে, যা শিখনের স্মৃতি-সহায়ক।

৯. মনোযোগ দিতে হবে এমন বিষয়ের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্রভাবে তার প্রতি নজর দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করে নিয়ে চর্চা করলে সুবিধা হবে।

১০. কম বয়সের ছাত্র- ছাত্রীদের জোরে জোরে পড়া অভ্যাস করা উচিৎ। উচ্চারণ নির্ভুল ও সঠিক রেখে জোরে জোরে সশব্দে পড়লে শ্রুতি ও অনুভূতি একযোগে তথ্যের সংকেতকে স্মৃতিভাণ্ডারে পাঠাতে পারে।

১১. আমাদের ভারতীয় সনাতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রাবস্থায় নিজের পড়াশোনার সাথে সাথে অন্যদের পড়ানোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হোত। নিজের শেখা জিনিস অন্যকে শেখালে সেই বিষয়বস্তু স্মৃতিসহায়ক হয়ে ওঠে।

১২. চাপমুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারলে স্মৃতি প্রয়োজনমত সাড়া দেয়। মানসিক উদ্বেগ বা টেনশানের মধ্যে থাকলে স্মৃতিতে থাকা তথ্য মনে আনতে খুবই অসুবিধা হয়।

১৩. কতক্ষণ পড়ছো সেটা বিবেচ্য নয়। বিবেচনা করতে হবে কত সময় তুমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশোনা করছো। উঁচু ক্লাসে উঠে যাবার পর মাঝরাত পর্যন্ত একটানা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলে ভালো। কারণ তখন ঘরে-বাইরে কোলাহল মুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়।

১৪. যে বিষয় কঠিন মনে হয় তাতে ভয় না পেয়ে, অল্প অল্প করে কিন্তু বারংবার পড়তে থাকো। অপছন্দের বিষয় এড়িয়ে গেলে পরীক্ষার আগে টেনশান কখনোই স্মৃতি-সহায়ক হবে না।

১৫. সাহিত্য, বিশেষত, কবিতা, পড়ার সময় মর্মার্থ বোঝার উপর জোর না দিয়ে নির্ভুল উচ্চারণে পড়তে পারলে সহজে মুখস্থ হয়। বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় মানে না বুঝে পড়লে ভালোভাবে আত্মস্থ করা যায় না।

১৬. মুখস্ত করা নানা বিষয় মাঝে মধ্যে লেখার অভ্যাস করো। লেখাপড়াতে 'পড়া' এবং 'লেখা' মনে রাখতে হবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। লেখার অভ্যাস বানান ভুল-সহ নানান ত্রুটি সংশোধন করে দিতে পারে।

১৭. কঠিন পাঠ্যবিষয় পড়ার সময় ভয় পেলে চলবে না। বিষয়কে ভালোবেসে শেখার চেষ্টা করো, সহপাঠীদের ও শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য নাও। ভয় বা উদ্বেগ কখনোই স্মৃতিসহায়ক নয়।

১৮. বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ছবি, ম্যাপ বা চার্ট তথ্যকে স্মৃতিভাণ্ডারে রাখতে সাহায্য করে। মনে রাখার সুবিধার জন্যে তুমি নিজেই দরকার মত ইনফরমেশন বকস বা ফ্লো-চার্ট বানিয়ে নিতে পারো।

১৯. পড়ায় যখন মন বসে তখন একনাগাড়ে অনেকক্ষণ পড়ে নাও। আর যদি মন না বসে, তাহলে শুধু শুধু বই সামনে নিয়ে বসে থাকার কোনো মানে নেই।পড়তে পড়তে ঘুম পেয়ে গেলে বা ঝিমুনি আসলে আর পড়া চালিয়ে গিয়ে লাভ হয় না। পড়া যদি মাথায় না ঢুকলো তাহলে শুধু শুধু রাত জেগে লাভ নেই।

২০. পরীক্ষার অনেকদিন আগেই সমস্ত সিলেবাস শেষ করে নেবে। তারপরে শুরু করবে বিষয়ভিত্তিক রিভিশান। প্রত্যেক বিষয়ের সম্ভাব্য সব ধরণের প্রশ্ন মুখস্ত করে নেবার পর লিখে তৈরি করে রাখবে। পাঠ্যবিষয় মনে থাকছে না ভেবে অযথা টেনশান করবে না। পরীক্ষার প্রস্তুতি যথাযথ হয়নি বলে একনাগাড়ে রাত জেগে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে না। একবার শরীর অসুস্থ হলে অনেক বেশি পড়ার সময় অপচয় হবে। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে মনের চাপ বাড়াবে না।

২১. কোনো পাঠ্যাংশ আত্মস্থ করার অব্যবহিত পরেই অন্য একটি ভিন্ন বিষয় শিখতে গেলে দ্বিতীয় বিষয়টির শিক্ষণ প্রথম বিষয়টির সংরক্ষণকে বাধা দেয়। ফলে প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষ আমরা ভুলে যেতে থাকি। তোমরা সুতরাং দুটি বিভিন্ন বিষয় শেখার মধ্যে সময়ের দিক থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখার চেষ্টা কোরো।

২২. একটি পাঠ্যাংশ একেবারে মুখস্ত করার চেষ্টা না করে যদি পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে দিনে দু'-একবার করে পড়া যায় তাহলে তা স্মৃতিতে রাখা সহজ হবে। ক্লাশে পড়া শুনতে শুনতে শিক্ষক মহাশয় দরকারী যা যা বলছেন তার নোট নেবে। এবং পরে তা অন্যান্য বই কনসাল্ট করে সুন্দর নোট আকারে বানিয়ে নেবে প্রত্যেকদিন।

২৩. নিঃশব্দে পড়ার চেয়ে জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়লে, তা সহজে মনে থাকে। উচ্চারণ করে পড়লে পাঠের জড়তা কেটে যায় আর উচ্চারণেও স্বচ্ছতা আসে। তাছাড়া ধীরে না পড়ে দ্রুতগতিতে পড়লে পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

২৪. জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে মনে পড়া মনঃসংযোগের বিচ্যুতি ঘটায়।পড়ার গতি বাড়ানোর জন্যে বইয়ের লাইনের উপর পেনসিল বা আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে যেতে হবে। এভাবে পড়লে চোখের অবস্থান চ্যুত হয় না।

২৫. পাঠ্যবিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝে নেবার জন্যে বই বা খাতার মার্জিনে পেনসিল দিয়ে দরকারি নোট লিখে রাখতে পারো। বিশেষভাবে মনে রাখার জন্যে পড়ার সময় প্রয়োজনীয় শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ ফ্লুরোসেন্ট মার্কার দিয়ে আণ্ডারলাইন করে দাগ দিয়ে রাখতে পারো।

Chapter -- 31

স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগের কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ ক্ষমতার পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়। নানান কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তির সমস্যা ও মনঃসংযোগের ব্যাঘাত হয়। এই নিবন্ধে আলোচনা করা হল বিবিধ স্মৃতিসমস্যা ও মনঃসংযোগের ঘাটতির কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

১. সেন্সরি মেমরি (Sensory Memory)

দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ ইত্যাদির সেন্সরি ইনফর্মেশন আমাদের মস্তিষ্কের সেন্সরি রিসেপটরের সাহায্যে স্মৃতিরূপে জমা হয়। তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া তথ্যের রেশ শেষ হবার পরেও চলতে থাকে। এই মেমরির সাহায্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত বুদ্ধি সফলভাবে ব্যবহার করে।

চিকিৎসা ঃ কনস্টিটিউশনাল যে সব মেডিসিন সেন্সরি মেমরি কার্যকারীতা বাড়াতে প্রভূত সাহায্য করে, তা হল ব্যারাইটা কার্বোনিকাম ৩০, কক্কিউলাস ইণ্ডিকা ৩০, ন্যাট্রাম কার্বোনিকাম ২০০, সিপিয়া ২০০ ইত্যাদি। নির্বাচিত একটি ঔষধের সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ১টি করে ডোজ প্রত্যহ রাত্রে শোবার আগে দশদিন খেলে ফল পাওয়া যাবে। সঙ্গে অ্যালুমিনা অক্সাইড ৬x (ট্রাইচ্যুরেশন) দিনে ২ বার ৩ গ্রেণ করে আধ-কাপ জলে সকালে-বিকালে খেতে হবে। তিন ধরণের সেন্সরি মেমরি বাড়াতে এইসব ঔষধ কার্যকরী।

ক) আইকনিক মেমরি (Iconic Memory)

ফ্লিটিং ইমেজ বা চিত্রকল্প পরম্পরা এই মেমরির সাহায্যে স্মৃতিতে ধরে রাখা হয়। ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্য মনে রাখার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এই স্মৃতি-প্রসরকে কাজে লাগাতে হয়। কেটামাইন প্লাস্টিসিটি (Ketamine Plasticity) -র জন্যে এই মেমরি ব্যহত হয়।

চিকিৎসা ঃ নির্দিষ্টভাবে এই ধরণের স্মৃতি-সমস্যায় নাক্স মস্কেটা θ (মাদার টিংচার) ৮-১০ ফোঁটা করে আধ-কাপ জলে মিশিয়ে দিনে ১ বার খালি পেটে সকালে একমাস খেলে ফল পাওয়া যায়।

খ) ইকোইক মেমরি (Echoic Memory)

মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের সেন্সরি এরিয়ায় অডিটরি ইনফর্মেশন এই মেমরির হাত ধরে প্রসেসিং হয়ে থাকে। এই মেমরির সমস্যা থাকলে ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে বুঝতে অসুবিধা হয়। এছাড়া, হিপ্পোক্যম্পাস-এর অলিগোডেনড্রোসাইট সেল-এর (Oligodendrocyte Cell) বিকৃতিতে এই মেমরির কার্যক্ষমতা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতিকে ঠিক রাখতে ক্রোটেলাস হ্যরিডাস θ (মাদার টিংচার) ৮-১০ ফোঁটা করে আধ-কাপ জলে মিশিয়ে শুধুমাত্র রাত্রে শোবার আগে পনেরো দিন খেতে হবে।

গ) হ্যাপটিক মেমরি (Haptic Memory)

স্পর্শের অনুভূতি স্পাইনাল কর্ডের অ্যাফারেণ্ট নিউরোণের পথ ধরে মস্তিষ্কের পোস্ট-সেণ্ট্রাল জাইরাস-এর স্মৃতিভাণ্ডারে জমা করে। এই মেমরির সাহায্যে আমরা পার্থিব যাবতীয় বস্তুর গঠণতন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত হই। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অ্যাস্ট্রোসাইট (Astrocyte) নামক গ্লিয়াল সেল-এর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পেলে এই মেমরির সমস্যা দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ এই স্মৃতির গোলযোগে বিশেষ ঔষধ হিসাবে অ্যাগারিকাস মাসকেরিয়াম θ (মাদার টিংচার) প্রেসক্রাইব করা হয়। আধ-কাপ জলে ৫ ফোঁটা করে দিনে ২ বার খালি পেটে পনেরো দিন খেলেই প্রতিকার মিলবে।

২. ভিস্যুয়াল মেমরি (Visual Memory)

মনের চোখ দিয়ে আমরা যে সব ভিস্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স প্রত্যক্ষ করি, তা স্মৃতিকক্ষে স্টোর করতে গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপটর (glucocorticoid receptor) ও মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপটর (mineralocorticoid receptor) এ ভূমিকা প্রধান। মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যম্পাস শুকিয়ে গেলে ভিস্যুয়াল মেমরির প্রসর অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। প্যালিনোপসিয়া (palinopsia) নামে ভিস্যুয়াল মেমরির একধরণের রোগ আছে – যাতে রোগীর মন থেকে বিশেষ চিত্রকল্পটি অপসারিত হবার পরেও বারংবার তা ফিরে আসে এবং পরবর্তী স্মৃতিগুলিকে মানসপটে থাকতে বাধা দেয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতিপ্রসরের গোলমালে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ২০০ বা ক্যালি ব্রোমেটাম ২০০ অব্যর্থ। নির্বাচিত ঔষধটির ১ ফোঁটা প্রতিদিন বিকালে একমাস খেতে পারলে ভালো ফল মিলবে।

৩. শর্ট-টার্ম মেমরি (Short Term Memory)

এই মেমরিকে অন্য নামে প্রাইমারি বা একটিভ মেমরি নামে অভিহিত করা হয়। এই মেমরির স্মৃতিধারণ ক্ষমতা মাত্র কিছুক্ষণ হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জেনারেল অ্যাপ্টিচিউড-এর উৎকর্ষ সাধনের জন্যে এর ভূমিকা অপরিসীম। পোষ্ট-সাইন্যাপটিক মার্কারের (postsynaptic marker) ক্ষয় থেকে এই স্মৃতির কার্যকারীতা হ্রাস পায়।

চিকিৎসা ঃ এই মেমরি ঠিক রাখতে অ্যাবিস নাইগ্রা ৩০ দিনে ২ বার ৪টি করে গ্লোবিউল দশদিন খেতে হবে।

৪. ওয়ার্কিং মেমরি (Working Memory)

ওয়ার্কিং অ্যাটেনশান-এর সাথে যুগ্মভাবে এই স্মৃতি আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়াকে সচল রাখে। ফোনোলজিক্যাল ল্যুপ (phonological loop) ও ভিস্যুও-স্প্যটিয়াল স্কেচ-প্যাড (visuo-spatial sketchpad)-এর সমস্যাতে এই স্মৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা ঃ এই স্মৃতির কার্যক্ষমতা ঠিক রাখতে ক্যলকেরিয়া কার্বোনিকাম ২০০ বা অ্যাসিড নাইট্রিক ২০০ প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো একটি ঔষধের সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ডোজ দিনে ২ বার সকালে-বিকালে একমাস খাওয়া দরকার।

৫. ফ্ল্যাশবাল্ব মেমরি (Flashbulb Memory)

এই স্মৃতি একটা বিশেষ মুহূর্তকে উচ্চকিত করে দেখায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনে হঠাৎ করে উচ্চতর চিন্তার জন্ম দেয়। এই মেমরির হাত ধরে আমাদের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমরি নিজস্ব রূপ ধারণ করতে পারে। মস্তিষ্কের অ্যামাইগডালা এরিয়ায় নিউরোণ সার্কিটে জিঙ্কের ঘাটতি হলে এই মেমরি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

চিকিৎসা ঃ এই স্মৃতি ব্যবহারে সমস্যা হলে ক্যফিয়া ক্রুডা ৩০ চমৎকার ফল দেয়। ঔষধটির ১ ফোঁটা দিনে ২ বার দিন-পনেরো খেলেই উপকার পাওয়া যাবে।

৬. লং-টার্ম মেমরি (Long-Term Memory)

একে রেফারেন্স মেমরিও বলা হয়। এই স্মৃতির সমস্যা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করার ক্ষমতা কমে যায়। এই স্মৃতির গোলযোগে স্মৃতিভাণ্ডারে জমিয়ে রাখা তথ্যপুঞ্জ ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। মিডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স ও ল্যটারাল হেবেনুলার (lateral habenula) বিপাকীয় গোলমাল থেকে এই মেমরি চূড়ান্ত স্মৃতি-সমস্যা তৈরী করে।

চিকিৎসা ঃ সাধারণভাবে এই মেমরির গোলযোগ হলে কনস্টিটিউশানাল রেমিডি হিসাবে অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টাল ৩০, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ২০০, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম ৩০, ফসফরিক অ্যাসিড ২০০, জিঙ্কাম মেটালিকাম ২০০ ইত্যাদি খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। যে কোনো ১টি ঔষধের সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ডোজ প্রথমে পনেরোদিন সকালে-বিকালে দিনে ২ বার খেতে হবে। পরে আরো দু'মাস সপ্তাহে ১ ডোজ করে খেলে চমৎকার ফল মিলবে।

ক) ইমপ্লিসিট বা প্রসিডিউরাল মেমরি (Implicit or Procedural Memory)

বেসাল গ্যাংলিয়নের নানা জায়গায় জমা থাকার পরে এই মেমরি স্মৃতিকক্ষে স্থানান্তরিত হয়। এটা এক ধরণের আনকনসাস মেমরি যা ইমোশনাল মেমরির স্মৃতিপথকে সুরক্ষিত রাখে। এই মেমরির ব্যাঘাত হলে শিক্ষার্থীরা অঙ্কে দুর্বল হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের ফ্রণ্টো-থ্যালামিক ল্যুপ-এর অসামঞ্জস্য বা গ্যালানিন (galanin) নামক নিউরো-পেপটাইডের কম নিঃসরণ থেকে এই স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেলে প্রধান ঔষধ হিসাবে কার্বোনিয়াম সালফিউরেটাম ২০০, মেডোরিনাম ২০০, অ্যাসিড পিক্রিকাম ৩০, গ্লোনোইন ২০০ ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়। বিশেষভাবে নির্বাচিত ওষুধটির সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ডোজ প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলায় একমাত্রা মাসখানেক খেতে হবে। পরের দু'মাস সেনোসিও অ্যরিয়েন্স θ (মাদার টিংচার) ১০ ফোঁটা করে আধ-কাপ জলে ১ বার করে রাত্রে খাবার পরে খেতে পারলে সুফল পাওয়া যায়।

খ) এক্সপ্লিসিট বা ডিক্লিয়ারেটিভ মেমরি (Explicit or Declerative Memory)

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের সময় মনে রাখা, পুরানো দিনের ঘটনাক্রম স্মরণ করা ইত্যাদি এই স্মৃতির উদাহরণ। মানব-মস্তিষ্কের মিডিয়াল টেম্পোরাল লোব ছাত্র-ছাত্রীদের এক্সপ্লিসিট লার্নিং-এর মধ্যে বিশেষভাবে দায়ী। মনো-অ্যামাইন অক্সিডেজ এনজাইম (MAO Enzyme)-এর বিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থেকে উদ্ভূত সমস্যা থেকে এই মেমরির ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ঃ সাধারণভাবে এই সমস্যায় অ্যাগনাস ক্যসটাস ৩০, স্ট্যাফিস্যগ্রিয়া ২০০, ক্যালি কার্বোনিকাম ৩০, অ্যামব্রা গ্রিসিয়া ৩০, প্লাম্বাম মেটালিকাম ২০০ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। নির্বাচিত ঔষধটির ১ ফোঁটা দুপুরে-রাত্রে খাবার পরে একমাস খেয়ে যেতে হবে। সঙ্গে

ব্যরাইটা অ্যাসিটিকা ২x (ট্রাইচ্যুরেশন) আধ-কাপ জলে ৪ গ্রেণ করে ১ বার সকালে খালি পেটে খেতে হবে।

অ) এপিসোডিক মেমরি (Episodic Memory)

জীবনের নানাবিধ ঘটনা সংরক্ষণ ও পুনরায় স্মরণ করা এই মেমরির কাজ। স্থানগত ও বিষয়গত ঘটনাপ্রবাহ এই মেমরির সাহায্যে প্রয়োজনে আমরা রি-কল করার চেষ্টা করি। এর হাত ধরে সিম্যাণ্টিক মেমরির জন্যে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট সিস্টেম তৈরী হয়। সাইণ্টিফিক রিভিশান মেথোড (SRM) ব্যবহার করার সময় এই মেমরির দরকার হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা আগের পড়া জিনিস নতুন করে মনে রাখতে পারে। ব্রেণ-এ প্লাজমা লিউসিন (Leucine)-এর পরিমাণ হ্রাস পেলে এই স্মৃতির ব্যাঘাত হয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের মেমরি প্রবলেমে ব্যবহৃত প্রধান ঔষধগুলো হল লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যভেটাম ২০০, ব্যারাইটা অ্যাসিটিকা ৩০, সিকেল কর্ন্যুটাম ২০০, অ্যাসিড বেঞ্জোয়িকাম ৩০, জিঙ্কাম পিক্রিকাম ২০০ ইত্যাদি। বিশেষভাবে নির্বাচিত ঔষধটি মডারেট পোটেন্সি ১ ফোঁটা করে রাত্রে খাবার পরে দু'মাস খেতে হবে। পাশাপাশি স্ক্যুটেলারিয়া ল্যটারিফ্লোরা θ (মাদার টিংচার) ১৫ ফোঁটা করে সকালে খালি পেটে আধ-কাপ জলে মিশিয়ে খেলে সমস্যা দূর হবে।

আ) স্প্যটিয়াল মেমরি (Spatial Memory)

কগনিটিভ ম্যাপের সাহায্যে এই মেমরি নানান স্থান-কাল-পাত্রের তথ্যপুঞ্জ মনে রাখতে পারে। ভূগোল, পরিবেশবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে এই মেমরির অবদান অনস্বীকার্য। মাইক্রো-গ্লিয়াল প্যাথোলজি আর ডেনড্রিটিক অ্যট্রফি (dendritic atrophy) -র জন্য এই স্মৃতির ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা ঃ সাধারণভাবে এই মেমরির উন্নতির জন্যে হেলিবোরাস নাইগার ২০০, ক্যলাডিয়াম ৩০, ক্যালি ফসফোরিকাম ২০০, সেলিনিয়াম ২০০ ইত্যাদি ঔষধ দারুণ কার্যকরী। নির্বাচিত ঔষধটির সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ডোজ-সকাল-সন্ধ্যে দিনে ২ বার একমাস খেতে হবে।

১) শর্ট-টার্ম স্প্যটিয়াল মেমরি (Short-Term Spatial Memory) - চিকিৎসা ঃ স্মৃতিশক্তির এই সমস্যায় ন্যট্রাম আয়োডেটাম ৬x (ট্রাইচ্যুরেশন) ব্যবহৃত হয়। ঔষধটির ৩ গ্রেণ মাত্রা দিনে ২ বার আধ-কাপ জলে মিশিয়ে একমাস ধরে খেয়ে যেতে হবে।

২) লংটার্ম স্প্যটিয়াল মেমরি (Long-Term Spatial Memory) - চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতি-সংক্রান্ত সমস্যা প্রকট হলে লিথিয়াম কার্বোনিকাম ৩x (ট্রাইচ্যুরেশন) খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। আধ-কাপ জলে মিশিয়ে ৪ গ্রেণ ঔষধ দিনে দু'বার একমাস ধরে খেতে হবে।

৩) স্প্যটিয়াল ওয়ার্কিং মেমরি (Spatial Working Memory) - চিকিৎসা ঃ এই প্রকারের কার্যনির্বাহী স্মৃতির অস্বাভাবিকতায় প্লাম্বাম আয়োডেটাম ২x (ট্রাইচ্যুরেশন) খেলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। দিনে ২ বার ৩ গ্রেণ করে ঔষধ খালি পেটে পনেরো দিন খেলেই হাতে-নাতে উপকার মিলবে।

ই) অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমরি (Autobiographical Memory)

জেনারেল নলেজ, পার্থিব যাবতীয় ঘটনা আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি হল এই স্মৃতির অন্তর্গত। জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে এই মেমরির ভূমিকা অনবদ্য। মস্তিষ্কের ডেণ্টেট জাইরাস (Dentate Gyrus)-এর মর্ফোমেট্রিক চেঞ্জ থেকে এই স্মৃতির ব্যাঘাত ঘটে।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতিকে প্রখর রাখতে থেরাপিউটিক মেডিসিন বেশী কার্য্যকরী। কনভ্যলেরিয়া মাজালিস θ (মাদার টিংচার) বা ইয়োনিমাস অ্যট্রোপারপিউরা θ (মাদার টিংচার) ৮ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার আধ-কাপ জলে মিশিয়ে দশ-পনেরো দিন খেলে প্রতিকার পাওয়া যাবে। পরে সপ্তাহে ১ ডোজ করে সিফিলিনাম ২০০ সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ডোজ তিন মাস খেলে খুবই ভালো।

৪) সিম্যানটিক মেমরি (Semantic Memory)

এই মেমরি আমাদের ভোকাব্যুলারি বা শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্যে এই ধরণের স্মৃতিকে কাজে লাগাতে হয়। আইডিয়া ও কনসেপ্ট গড়ে তুলতে আমাদের সিম্যানটিক মেমরিকে ব্যবহার করতে হয়। মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যম্পাসে কিন্যুরেনিক অ্যাসিড (Kynurenic acid) ও ক্যুইনোলিনিক অ্যাসিড (Quinolinic acid) -এর ঘনত্ব কমে গেলে এই স্মৃতির ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের স্মৃতিহ্রাসের সমস্যায় ল্যাক ক্যনিনাম ২০০, ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া ৩০, ফ্যাগোপাইরাম ২০০, প্লাম্বাম মেটালিকাম ৩০ ইত্যাদি দারুণ কার্যকরী। নির্বাচিত ঔষধটির ১ ফোঁটা দিনে ২ বার আধ কাপ জলে মিশিয়ে একমাস ধরে খেতে হবে। সঙ্গে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৩x (ট্রাইচ্যুরেশন) বা মার্ক্যিয়োরিয়াস সায়ানেটাস ২x (ট্রাইচ্যুরেশন) আধ-কাপ জলে মিশিয়ে ৪ গ্রেণ পরিমাণ ঔষধ সকালে খালি পেটে একমাস খেতে হবে।

১. ফোকাসড অ্যাটেনশান (Focused Attention)

শ্রবণযোগ্য, দৃশ্যমান, স্পর্শগ্রাহ্য প্রণোদনা এই ধরণের মনোযোগের মাধ্যমে দীর্ঘায়িত হয়। এই মনোযোগ ঠিক না থাকলে, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে পাঠদান শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয়। মস্তিষ্কের ব্রেণ-ডিরাইভড নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টর-এর সিরাম লেভেল (BDNF Serum Level) হ্রাস পেলে এই মনোযোগের ব্যাঘাত হয়।

চিকিৎসা ঃ এইপ্রকার মনোযোগের বিকারে কার্বো অ্যানিম্যলিস ২০০, সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ৩০, নাক্স মস্কেটা ২০০ প্রভৃতি সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হয়। নির্বাচিত বিশেষ ঔষধটি ১ ফোঁটা করে রাত্রে শোবার আগে তিন-সপ্তাহ খেলে ফল পাওয়া যায়। সাথে ইউফর্বিয়া ল্যথাইরাস θ (মাদার টিংচার) সকাল-বিকাল দিনে ২ বার আধ-কাপ জলে মিশিে ১০ ফোঁটা করে খেতে হয়।

২. সাসটেণ্ড অ্যাটেনশান (Sustained Attention)

একে কনসেনট্রেশান বা মনঃসংযোগও বলা হয়। এই মনোযোগের বিস্তারের সাহায্যে বিহেভিয়ারাল রেসপন্স ও রিপিটেটিভ অ্যাক্টিভিটি স্মৃতিতে ধরে রাখা যায়। অতিরিক্ত কর্টিকোস্টেরয়েড নিঃসরণ থেকে শিক্ষার্থীদের মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

চিকিৎসা ঃ মনঃসংযোগের এই সমস্যায় সিঙ্কোনা অফিসিনালিস ৩০, লিলিয়াম টাইগ্রিনাম ২০০, পেট্রোলিয়াম ২০০ ইত্যাদি খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। যে কোনো একটি ঔষধের ৪টি করে গ্লোবিউল দিনে ২ বার তিন-সপ্তাহ ধরে খেতে হবে। পাশাপাশি জিঙ্কাম ভ্যলেরিয়ানা ২x (ট্রাইচ্যুরেশন) আধ কাপ জলে মিশিয়ে ৩ গ্রেণ করে রাত্রে শোবার আগে খাওয়া দরকার।

৩. অল্টারনেটিং অ্যাটেনশান (Alternating Attention)

বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় পড়ার জন্যে, ভিন্ন ধরণের বিষয় পরপর মনে রাখার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের যদি মেণ্টাল ফ্লেকসিবিলিটি না থাকে — তা হলে এই মনোযোগের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এই অ্যাটেনশানের হাত ধরে পড়াশোনার ফোকাস শিফট করতে হয়। মস্তিষ্কের সাবকর্টিক্যাল এরিয়া (কডেট নিউক্লিয়াস ও থ্যালামাস) এবং লিম্বিক সিস্টেম (অ্যামাইগডালা ও অ্যাণ্টিরিয়র হিপ্পোক্যম্পাস)-এর হাইপার-অ্যাক্টিভিটি থেকে এই মনোযোগ বিচ্যুত হয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের মনোযোগের বিকারে ক্যমোমিলা ২০০, পিক্রিক অ্যাসিড ৩০, গ্লোনোইন ৩০, জিঙ্কাম মেটালিকাম ২০০ ইত্যাদি প্রেসক্রাইব করা হয়। বিশেষ নির্বাচিত ঔষধের সুগার অফ মিল্ক-এ বানানো ১ ডোজ প্রত্যহ সকালে খালি পেটে খেতে হবে। কার্যকরী উপকার পেতে একটিয়া স্পাইকেটা θ (মাদার টিংচার) আধ-কাপ জলে মিশিয়ে ১০ ফোঁটা করে দিনে ২ বার একমাস খেতে হবে।

৪. ডিভাইডেড অ্যাটেনশান (Divided Attention)

এটা আমাদের মনোযোগের চূড়ান্ত পর্যায়। এই মনোযোগের হাত ধরে শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি কাজ একসাথে করে থাকে এবং লেখাপড়ায় কাঙ্খিত সাফল্য পায়। গ্লুটামেটার্জিক নিউরোণের (glutamatergic neurone) মাইটোকনড্রিয়াল এনার্জি প্রডাকশন কম হলে এই মনোযোগের বিকার দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ এইপ্রকার মনোযোগের বিকারে কফিয়া ক্রুডা ৩০, সিপিয়া ৩০, রোডোডেনড্রন ২০০ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যে কোনো একটি ঔষধের ৪টি করে গ্লোবিউল দিনে ২ বার তিন-সপ্তাহ খেলে উপকার হবে। সঙ্গে বিসমাথ সাবনাইট্রেট ২x (ট্রাইচ্যুরেশন) আধ-কাপ জলে মিশিয়ে ৪ গ্রেণ করে সকালে খালি পেটে খেতে হবে।

৫. সিলেকটিভ অ্যাটেনশান (Selective Attention)

পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব বিচার করে এই মনোযোগ কাজ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই মনোযোগের ব্যবহার বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তাদের শিখন-প্রক্রিয়া উৎকর্ষমণ্ডিত হবে। বিচ্যুত মনোযোগকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় ব্যবহার করা শিক্ষার্থীর সাফল্যতে ত্বরান্বিত করে। মস্তিষ্কের সারক্যুলেটরি অ্যামাইনো-পেপটাইডেজ গুলোর (plasma dipeptidyl-peptidese, prolyl-oligoeptodese, etc.) নিঃসরণ হ্রাস পেলে এই মনোযোগের বিকার দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ এই ধরণের মনোযোগের ঘাটতি মেটাতে ব্যারাইটা কর্বোনিকাম ৩০, ক্যালি ব্রোমেটাম ২০০, সাইলিসিয়া ২০০ ইত্যাদি খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। নির্বাচিত একটি ঔষধের ১ ফোঁটা করে দিনে ২ বার তিন-সপ্তাহ ধরে খেতে হবে। সঙ্গে খেতে হবে ভিবার্নাম প্রুনিফোলিয়াম θ (মাদার টিংচার) আধ-কাপ জলে মিশিয়ে ১৫ ফোঁটা করে রাত্রে শোবার আগে।

(পুনশ্চ ঃ স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগের চিকিৎসায় উপরে বর্ণিত ঔষধগুলি সংশ্লিষ্ট রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সেবন করতে পারেন। রোগলক্ষণ বৃদ্ধি পেলে নিউরো-সাইকিয়াট্রিতে বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাবেন)।

Chapter -- 32

হোমিওপ্যাথিতে বাড়ে মেমরি ও ব্রেণ-পাওয়ার

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা নিয়ে নানান সমস্যা। কারুর শুনি মনঃসংযোগ ও একাগ্রতার অভাব, কেউ বলেন তাঁর সন্তানের বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, বা সে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে হলে জানা দরকার মেমরি ও ব্রেণ-পাওয়ার বাড়ানোর উপায়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় স্বীকৃত, উচ্চ প্রশংসিত নেমনিক্স বিজ্ঞানের আলোকে লিখিত এই নিবন্ধে প্রিয় শিক্ষার্থী ও সচেতন অভিভাবকগণের জন্যে থাকলো তারই সুলুক-সন্ধান।

প্রঃ মেমরি বা স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর টেকনিকগুলো কি রকম?

মেমরি বা স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর নানান উপায় আছে। যেমন ধরুন...

১. চাঙ্কিং মেথোড্– চাঙ্কিং মানে গ্রুপিং বা ছোট ভাগে বিভক্ত করা। ল্যাণ্ড-ফোন বা মোবাইল নাম্বার মনে রাখার জন্যে অথবা কঠিন বানান মনে রাখার জন্যে এই পদ্ধতি দারুণ কার্য্যকরী। যেমন, ৯৮৩১১৪৮১১২ এই মোবাইল নাম্বারটা সহজে মনে রাখতে হলে ডিজিটগুলোকে এইভাবে গ্রুপিং করে নিতে হবে – ৯৮৩, ১১, ৪৮, ১১২, আবার ধরুন, 'Lieutenant' (লেফটেন্যাণ্ট) – এই শব্দটি এইভাবে সহজে মনে রাখা যেতে পারে – 'Lieu+ten+ant' অথবা ধরুন, 'Together' – এই শব্দটি মুখস্থ রাখার জন্যে আমরা ভেঙে ভেঙে এইরকমভাবে বলতে পারি – 'To+get+her'.

২. বেড-টাইম রিসাইটাল – যে পাঠ্যবিষয় ছাত্রকে মনে রাখতে হবে, দিনের কোনো একসময় পড়ার পরে তার সংক্ষিপ্তসার একটুকরো কাগজে লিখে রাখতে হবে। রাতে শুতে যাবার আগে দু'-তিন বার সেটা জোরে জোরে আবৃত্তি করে তারপরে সে বিছানায় শুতে যাবে। তারপর, যখন সেই ছাত্র ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তার ব্রেণ-এর মেমরি সেণ্টার সদ্য শেখা তথ্যাবলী রেকর্ডিং করে একের পর এক শ্রেণীবদ্ধ করে মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখবে।

৩. তথ্যের অনুষঙ্গ ল' অফ অ্যাসোসিয়েশন – তথ্যের সাথে নতুন একটি তথ্যের অনুষঙ্গ গড়ে তুলতে না পারলে, তা কখনোই জ্ঞানে রূপান্তরিত হবে না এবং বেশীদিন তা স্মৃতিপথে থাকবেও না। আমরা সবাই জানি, ছোট বাচ্চাদের যদি সুরে-তালে আর নাচের সঙ্গে কোনো ছড়া বা রাইমস্ শেখানো হয়, তারা তা সহজে ও তাড়াতাড়ি শিখে ফ্যালে। ছাত্র-ছাত্রীরা তোমরা যারা বড়োরা, তারা টেকনিক্যাল ইনফর্মেশন নিজ নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাথে রিলেট করে পাঠ্যবিষয় পড়লে উপকৃত হবে।

৪. ব্রীজিং টেকনিক – একটি ঘটনা অন্য ঘটনার তথ্যের অনুষঙ্গে মধ্যস্থতা করে স্মরণক্রিয়াকে সহজতর করে। ইতিহাস পাঠের সময় ঘটনার সাথে ঘটনার সেতুবন্ধন না করে পড়লে মনে রাখা খুবই কঠিন।

৫. নিজের ফাঁকা পড়ার ঘরে শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করো – মনে করো, তোমার সামনে ঘর-ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী বসে তোমার পড়ানো শুনেছে। হাতের ভঙ্গীসহ অন্যান্য যে সব স্টাইল ব্যবহার করে ক্লাশ-টিচার তোমাদের 'ড্রামাটিক ওয়ে অফ টিচিং' উপহার দেন, সেগুলোর সাহায্যে পড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ করে তুমি পাঠ্যবিষয় বলতে থাকো। দেখবে, মনে রাখার তথ্যগুলো কত সুষ্ঠভাবে তোমার মনে থাকবে।

৬. রিডিং ডিনামিক্স ঃ মেটা-গাইডিং এণ্ড স্কীমিং– পাঠ্যবিষয়ের যে লাইনটা তুমি পড়ছো তার নিচে আঙুল বা পেনসিল দিয়ে পাঠক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে গেলে, তা শিখন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। আর সেটাই হল মেটা-গাইডিং। অন্যদিকে স্কীমিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় স্পীড্ রিডিং করার জন্যে। এই পদ্ধতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশে ভাসা-ভাসা চোখ বুলিয়ে পাঠ্যবিষয়ের দরকারী অংশে মনঃসংযোগ করতে বলা হয়। বিশেষতঃ ইতিহাসের অনেক দীর্ঘ পাঠ সংক্ষিপ্তসার আকারে মনে রাখার জন্যে এই পদ্ধতি কার্যকরী। এরকম আরো নানান পদ্ধতি আছে যা আমি স্কুলে স্কুলে এন.আই.সি.পি. ও গ্রীণ মেমরি ক্লিনিক-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে শেখানোর চেষ্টা করি।

এছাড়াও, যে বিষয় শিখতে হবে তার সাথে যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমন্বয় করতে পারো, তাহলে শিখতে তোমার সুবিধা হবে। স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, গতিশীলতা, অনুভূতি ও ত্রি-মাত্রিক ছবির অনুষঙ্গে যদি তুমি শিখতে পারো, তা খুবই স্মৃতি-সহায়ক হবে। খটোমটো লাগে, শুনতে অদ্ভুতরকম লাগে, এমন জিনিসের সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পাঠ্যবিষয়কে রিলেট করে পড়ে, তাহলে খুব সহজে মনে থাকবে।

প্রঃ অন্য আর কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি-মেধা বাড়ানো যায়?

১. ফীড্ব্যাক থ্রু ইমেজ স্ট্রীমিং – তোমার পড়ার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে বা মেঝেতে মাদুর পেতে বসো।

ঘরের বা তৎসংলগ্ন পরিবেশ শান্ত হলে ভালো হয়। এবার তুমি চোখ বন্ধ করো। দেখবে, তোমার সামনে নানা ছবি ভেসে উঠেছে। তুমি এবার তা উচ্চারণ করে বর্ণনা করো। এভাবে আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কো-অর্ডিনেশান বিকশিত হবে এবং তোমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ঘটবে।

২. ফীড্-ফরোয়ার্ড থ্রু সেল্ফ ফুলফিলিং প্রফেসি – তোমার স্টাডি টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করো। এবার ভাবার চেষ্টা করো, ভবিষ্যতে তুমি যা হতে চাও তার পরিমণ্ডল রচনা করতে। সফল সেই ভবিষ্যত নির্মাণের পর প্রাপ্ত আনন্দকে তুমি তোমার বর্তমান জীবন ও জীবনচর্যাকে আস্বাদন করার সুযোগ দাও। মোট কথা, ভবিষ্যতের সাফল্যকে যদি তুমি ঘটমান বর্তমানে দারুণভাবে উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে সুন্দরভাবে তোমার কল্পনাশক্তির বিকাশ হবে যা বুদ্ধি বাড়াতে অব্যর্থ।

৩. মাতৃদুগ্ধ মেধা বাড়ায় – যে সকল বাচ্চা মাতৃদুগ্ধ পান করার সুযোগ পায়, তাদের মেধা ও বুদ্ধি সাধারণত বেশী হয়। মাতৃদুগ্ধ শরীর ও নার্ভের ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী রাখে। মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা এক মেমরি সেল থেকে তথ্য নিয়ে অন্য মেমরি সেল-এর মাধ্যমে স্মৃতির মণিকোঠায় স্টোর করতে সাহায্য করে।

এছাড়াও, এমন কিছু উপাদান আছে যারা ব্রেণ-এর পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে। যেমন, ভিটামিন বি-থ্রি বা প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড যা আখের গুড়ে, মিষ্টি আলু ও মটরশুঁটি থেকে পাওয়া যায়। অথবা ধরুন, ভিটামিন বি-ফাইভ থেকে প্রাপ্ত নিয়াসিনামাইড যা চীনাবাদাম, সোয়াবিন ও ভোজ্য প্রাণীদের লিভার থেকে পাওয়া যায়। কিছু কিছু ট্রেস্ এলিমেণ্ট আছে, যারা মেমরি সেল যাতে ড্যামেজ না হয়ে যায় তার খেয়াল রাখে। যেমন, ম্যাঙ্গানিজ, যা আমরা, যে সকল প্রাণীদের আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তাদের লিভার, হার্ট বা অগ্ন্যাশয় থেকে পেয়ে থাকি। এল-টাইরোসিন আবার মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় মেমরি সেল-এর প্রোটিনগুলোকে গঠন দান করে। কিছু কিছু উপাদান আছে, যারা হায়ার কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট-এর জন্যে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, টু-ডাইমিথাইল অ্যামাইনো-ইথানল (DMAE) – এটি এমন এক ধরণের অ্যামিটাইল-কোলিন প্রিকাসর যা পরবর্তী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ উন্নতমানের নিউরোট্রান্সমিটার তৈরীতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, মেধাশক্তির উন্নয়ন এবং দীর্ঘক্ষণ মনঃসংযোগ ধরে রাখতে DMAE-এর জুড়ি নেই।

প্রঃ আজকাল একটা কথা শুনছি 'নেমনিক সায়েন্স'। এটা আসলে কি?

নেমনিক্স (Mnemonics) হল আর্টিফিসিয়াল এড্ ট্যু মেমরি। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত এই পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে নিতে পারে। বিজ্ঞান-নির্ভর পদ্ধতি এই 'নেমনিক্স' যা সারা বিশ্বে মেমরি ও ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানোর ব্যাপারে উচ্চ-প্রশংসিত। নেমনিক্স-এর সাহায্যে মেমরি ইমপ্রুভমেণ্ট টেকনিকস্ ট্রেনিং-এ আমরা দীর্ঘ পাঠ্যবস্তু সংক্ষিপ্তসার আকারে মনে রাখার জন্যে কার্যকরী পদ্ধতি শেখাই, অখণ্ড একাগ্রতা বাড়ানোর পদ্ধতি ও স্মরণ-ক্রিয়ার উচ্চাঙ্গের কৌশল শেখাই, এরগোনমিক্স-এর নীতি মেনে স্পীড রিডিং পদ্ধতি ও ইচ্ছাধীন মনোযোগের বিকাশ ঘটানোর কৌশল শেখাই। এছাড়াও, স্মৃতিপ্রসর ও ব্রেণ-পাওয়ার বাড়ানোর মেণ্টাল একসারসাইজ, মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্যে রিল্যাক্সেশন পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল, পড়াশুনার টাইম-ম্যানেজমেণ্ট ও পরীক্ষার আগে পড়াশুনার আদব-কায়দা সহ নানারকম স্মৃতি-সহায়ক পদ্ধতি শেখানো হয়।

প্রঃ ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ধরণের যে সকল লার্নিং ডিসএবিলিটি (Learning Disability) থাকে, সে সব কি 'নেমনিক সায়েন্স'-এর টেকনিকগুলোর সাহায্যে ম্যানেজ করা যায়?

না, নেমনিক্স-এর পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে লার্নিং ডিসএবিলিটি ম্যানেজ করা যায় না। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কিছু ডিসএবিলিটি ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিং ও নিউরো-সাইকিয়াট্রিক এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন-এর সাহায্যে লার্নিং ডিসএবিলিটি সমস্যার সমাধান করা হয়। এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় সচেতন অভিভাবকগণের অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় পঞ্চাশ রকমের লার্নিং ডিসএবিলিটির সমস্যা দেখা যায়। শারীরিক বা মানসিক আঘাত, ড্রাগ নির্ভরতা বা ব্রেণ-এর নার্ভ সংক্রান্ত রোগের জন্য অ্যামনেসিয়া (amnesia) বা স্মৃতিহ্রাস হতে পারে। অ্যান্টেরোগ্রেড্ অ্যামনেসিয়া, রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া, বা অরগ্যানিক, ট্রম্যাটিক ও সাইকোজেনিক অ্যামনেসিয়াতে আপনার সন্তানের মেধাহ্রাস ও স্মৃতিসমস্যা হতে পারে। কনডাকশান অ্যাফেসিয়া (aphesia) ইত্যাদি ১০-১২ রকমের লার্নিং ডিসএবিলিটিতে আমাদের ব্রেণ-এর ল্যাঙ্গুয়েজ সেণ্টার ও ব্রোকা'জ এরিয়া-র কোনো রোগ, আঘাতপ্রাপ্তি বা অন্য ধরণের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা বোঝা ও প্রকাশ করার সমস্যা হয়, লিখতে ও পড়তে অসুবিধা হয় আর শব্দ উচ্চারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। নিচু ক্লাসের বাচ্চাদের মস্তিষ্কের প্যারাইটাল লোব-এর রোগের জন্যে ২০-২২ রকমের অ্যাপ্রেকসিয়া (apraxia) ও অ্যাগনসিয়া (agnosia) দেখা দেয়, যাতে তারা সহজ ড্রয়িং বা প্যাটার্ন দেখে নিজে তা আঁকতে পারে না, যথাযথ শারীরিক অঙ্গ চালনায় সড়গড় হতে পারে না বা সুষ্ঠ উচ্চারণে কথা বলতে পারে না। কেউ কেউ আবার তার অনুভূতি যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারে না, রং চিনতে অসুবিধা হয়, গন্ধ ও স্বাদ চিনতে পারে না, এতে শিশু পরিচিত আওয়াজ বা আগে-শোনা শব্দও ঠিকঠাক চিনতে পারে না। এ ধরণের কোনো লক্ষণ আপনার স্কুল-পড়ুয়া সন্তানের মধ্যে দেখলে অবশ্যই এ্যালোপ্যাথ বা হোমিওপ্যাথ নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পরামর্শ নেবেন।

প্রঃ ভাষা-সংক্রান্ত শেখায় ক্ষমতার অভাব, যাকে ডিসলেকসিয়া (Dyslexia) বলা হয় – সেটাও কি একধরণের লার্নিং ডিসএবিলিটি?

হ্যাঁ, অ্যামনেসিয়া, অ্যাফেসিয়া, অ্যাপ্রেকসিয়া বা অ্যাগনসিয়া-র মতই ডিসলেকসিয়াও এক ধরণের লার্নিং ডিসএবিলিটি। মূলতঃ মস্তিষ্কের বাঁদিকের অংশে আঘাতের জন্যে অ্যাকোয়ার্ড ডিসলেকসিয়া বা ডেভেলপমেণ্টাল ডিসলেকসিয়া দেখা দেয়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে পড়তে আর বানান করতে অসুবিধা হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর নতুন নতুন শব্দ চিনতে অনেক বেশী সময় লাগে, এরা সমবয়সীদের তুলনায় দেরীতে কথা বলতে শেখে, কথা বলার সময় এদের উপযুক্ত সঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়। অনেক বাচ্চার অক্ষর পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, কেউ কেউ আবার নিজের নাম বানান করে বলতে বা লিখতে সমস্যায় পড়ে। কারুর কারুর লেখায় কিছু কিছু অক্ষর উল্টে-পাল্টে যায়, দুটি অক্ষরের মধ্যে মিল থাকলে তাদের প্রভেদ বুঝতে সমস্যা হয়। বাচ্চার যদি ফোনোলজিক্যাল ডিসলেকসিয়া থাকে, তবে তার শব্দের সঠিক উচ্চারণে খুবই অসুবিধা হয়।

প্রঃ মেমরি ও মনঃসংযোগ বাড়ানোর জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আর কি কোনো পরামর্শ দেবেন?

১. বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর মেমরি বিভিন্ন রকম। মানুষে মানুষে বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তির এই যে পার্থক্য, এর পিছনে বংশগতির (genetic transmission) কোনো ভূমিকা নেই। পাঠ্যবিষয়ে অপার আগ্রহ, পড়ার ঘরের পরিবেশ ও ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জীবিত মানসিক অবস্থার সাথে পড়াশোনার সঠিক পদ্ধতির একনিষ্ঠ প্রয়োগেই স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়। কোনো বিষয়ের ইনফরমেশন সিনগ্যাল যত বেশী বার মেমরি লেন-এ থাকা সাইন্যাপসের পথ দিয়ে যাবে, তত কমে যাবে সাইন্যাপটিক রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার এবং অবশেষে সেই তথ্যপঞ্জী আমাদের স্মৃতিভাণ্ডারে গিয়ে জমা হবে। সেইজন্যে, যত তুমি পড়বে, ততই কমে যাবে সাইন্যাপসের প্রতিরোধ। সাইন্যাপসের প্রতিরোধের ধাক্কায় পাঠ্যবিষয় যাতে স্মৃতি থেকে হারিয়ে না যায় তার জন্যে বারংবার পড়া জরুরী।

২. কম বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জোরে জোরে পড়া অভ্যাস করা উচিৎ। উচ্চারণ নির্ভুল ও সঠিক রেখে জোরে জোরে সশব্দে পড়লে শ্রুতি ও অনুভূতি একযোগে তথ্যের সংকেতকে স্মৃতিভাণ্ডারে পাঠাতে পারে। একটি পাঠ্যাংশ একেবারে মুখস্ত করার চেষ্টা না করে যদি পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে দিনে দু'-চার বার করে পড়া যায় তাহলে তা স্মৃতিতে রাখা সহজ হবে।

৩. তথ্যকে স্মৃতিভাণ্ডারে ধরে রাখার কৌশল, স্মৃতি-সহায়ক ছড়া, ইত্যাদি হল নেমনিক্স (Mnemonics)। আর ইনিউমারেশান (Enumeration) হল সংশ্লিষ্ট তথ্যপুঞ্জ স্মৃতির আলমারিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকায় সংরক্ষিত রাখা। সবশেষে, সাজানো তালিকা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে মেমরি স্প্যান-এ সাজিয়ে নেওয়া, যাকে আমরা গ্রুপিং (Gruping) বলি। এই তিনটি বিষয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইনফরমেশন (Association of Information) যদি যুক্ত হয়, তবেই ছাত্র-ছাত্রীরা একমাত্র স্পীড্ লার্নিং-এর উপকারিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ ব্রেণ পাওয়ার বাড়ানোর জন্যে বিশেষ কিছু পরামর্শ?

১. নানান ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত খেলাধূলা বা বুদ্ধিমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে মনের ব্যায়াম হয়। শব্দছক, দাবা, অন্ত্যাক্ষরী ইত্যাদি অবসর সময়ে চর্চা করলে মস্তিষ্কচালনা তীব্র হয়।

২. অনেকে দেখা যায়, কথায় কথায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন। এটা কালক্রমে স্মৃতিশক্তির জড়তা ডেকে আনতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের বলছি, নিজের সামর্থ্যমত যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ খাতায়-কলমে বা মনে মনে সমাধান করার চেষ্টা করবে।

৩. ব্রেণ-ফাংশান বাড়াতে যোগাসন, প্রাণায়াম ও খেলাধূলার বিকল্প নেই। ব্রেণ পাওয়ার বাড়াতে নতুন ভাষা শিক্ষার কোনো জুড়ি নেই। বিদেশী ভাষা শেখার অনাবিল আনন্দ ব্রেণের সক্রিয়তাকে গতিশীল রাখে।

প্রঃ কোন্ কোন্ খাবার খেয়ে মেমরি ও ব্রেণ-পাওয়ার বাড়ানো যায়?

১. ওমেগা-থ্রি-ফ্যাটি অ্যাসিড – যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল DHA (ডেকোসা হেক্সায়োনিক অ্যাসিড), যা ব্রেণের সেল মেমব্রেণ-এর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে বাচ্চাদের মস্তিষ্কের বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা নেয় ও বিভিন্ন ধরণের স্মৃতিকে সতেজ রাখে। মেমরি পাওয়ার বৃদ্ধিতে সহায়ক এই অ্যাসিড মিঠা জলের রুই-কাতলা প্রভৃতি পোনা মাছে এবং সার্ডিন, পমফ্রেট ইত্যাদি সামুদ্রিক নোনা মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

২. অ্যান্টি-অক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ খাবার – আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ফ্রী-র‍্যাড়িক্যালস্ গুলোকে ধ্বংস করে দেহের নিউরোট্রান্সমিশন সিস্টেমকে চাঙ্গা রাখে অ্যান্টি-অক্সিডেণ্ট, যা আবার ব্রেণের অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে মেমরি ও মেধাশক্তির বিকাশ ঘটায়। ভিটামিন-ই র মধ্যেকার যৌগ টোকোফেরল আর টোকোট্রিয়েনল-এর মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেণ্ট-এর গুণ আছে যা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। পাইরিডক্সিন (Vitamin-B_6) থেকে উৎপন্ন কো-এনজাইম পাইরিডক্সাল ফসফেট ব্রেণের অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ফুলকপি, টম্যাটো, পাতা-যুক্ত সবুজ শাক-সব্জী, বিন, স্ট্রবেরি ছাড়াও আমলকি, খেজুর, রসুন, আঙুর প্রভৃতিতে উন্নতমানের অ্যান্টি-অক্সিডেণ্ট পাওয়া যায়।

৩. ফাইটো কেমিক্যালস্ – ব্লু-বেরি ও কমলালেবু থেকে প্রাপ্ত অ্যানিথোসায়ানিন নামের ফাইটো-কেমিক্যালটি ব্রেণ ডেভেলপমেণ্ট ও মেমরি বাড়াতে এবং স্মৃতিহ্রাস আটকাতে সাহায্য করে। ডিমের কুসুম ও সোয়াবিন থেকে প্রাপ্ত লিসিথিন নতুন নতুন মেমরি সেল তৈরীতে সাহায্য করে। জিংকো বাইলোবা ও জিনসেং নামের দুটি ভেষজ ব্রেণের নার্ভের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে, মস্তিষ্কে গ্লুকোজ মেটাবলিম-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং স্মৃতি-প্রসরকে বাড়িয়ে তুলে আমাদের মনঃসংযোগ ও বহুক্ষণ পাঠে একাগ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের জ্বালানি এল-গ্লুটামাইন ব্রেণের কার্যক্ষমতায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া তুলে নিয়ে আমাদের পড়াশোনা-জনিত মানসিক ক্লান্তি দূর করে। এছাড়াও, ফিনাইল অ্যালানিন নামের অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার ক্ষমতা

এবং দীর্ঘকাল তা মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর ফসফোলিপিড ব্রেণ-এর সেলুলার ডেভেলপমেণ্ট-এ অংশগ্রহণ করে। সেফালিন ও ফসফাটিডিলসারিণ নামক দুটি ফসফোলিপিড নতুন নতুন মেমরি সেল তৈরীতে সাহায্য করে।

৪. **এসেনসিয়াল নিউট্রিয়েন্টস্** – আপেলে প্রাপ্ত কোর্য়াসিটিন স্মৃতিভ্রংশতা প্রতিরোধে উপকারী। হলুদে ঔষধি গুণ-সম্পন্ন কিউর্কামেন একটি স্মৃতিহ্রাস রোধক অ্যাণ্টি-অক্সিডেণ্ট। বুদ্ধি ও মেধার বিকাশে তিসির তেল, মসীনার তেল বা মাছের তেল খুবই উপকারী। এছাড়া লেটুস শাক, ব্রাহ্মী শাক, মধু ইত্যাদি সহজলভ্য স্মৃতিবৃদ্ধিকারক যা আমাদের হায়ার কগনিটিভ ফাংশানগুলোকে উজ্জীবিত রাখে।

প্রঃ স্মৃতিশক্তি-সংক্রান্ত সমস্যা ও ছাত্র-ছাত্রীদের লার্নিং ডিসএবিলিটির চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিজ্ঞানে মেমরি প্রবলেম-এর সুফলদায়ক চিকিৎসা আছে। অল্পবুদ্ধি, মনে রাখার ক্ষমতা হ্রাস, পড়াশোনায় অমনোযোগী ও একাগ্রতার অভাব, স্কুলভীতি, পরীক্ষাভীতি, লেখাপড়ায় ক্লাশে পিছিয়ে পড়া, শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করে চলতে না পারা, রাত জেগে পড়াশোনা করার জন্যে স্নায়ুবিক দৌর্বল্য ও স্মৃতিভ্রংশতা বা মস্তিষ্কের রোগজনিত কারণে বিলম্বিত মেধার শিকার ইত্যাদি সমস্যায় কনস্টিটিউশনাল ও থেরাপিউটিক হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন দারুণভাবে কার্য্যকরী। এছাড়া মাইক্রো-ডোজ ক্ল্যাসিক্যাল মেডিসিনের সাহায্যে লার্নিং ডিসএবিলিটির ফলপ্রসূ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আধুনিক হোমিও-বিজ্ঞানের প্রমাণিত সাফল্য। সীমিত পরিসরে এখানে ওষুধ নিয়ে চর্চা করার সুযোগ নেই। সুধী অভিভাবকগণ যদি তাঁদের সন্তানের বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ সংক্রান্ত সমস্যা বা লার্নিং ডিসএবিলিটির চিকিৎসার জন্যে নিউরো-সাইকিয়াট্রিতে বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে ও লেখাপড়ায় কাঙ্খিত আশানুরূপ সাফল্য পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

Dr. Jakir Hossain Laskar, PhD
Consultant Homeopath (in Neuro-Psychiatry)
M.Sc., D.H.M.S., M.S. (Counseling & Psychotherapy), PhD
Certified in: Stress Management (IIT Kharagpur)
U.D.A. (UK), L.M.S.M. (USA), D.U.M.C.B. (England)
Author of:
Clinical Homeopathic Organotherapy (Published from USA)

Clinic Address:
BrainMindia Homeopathy Neuro-Psychiatry Clinic
85, Bentinck Street (3-rd Floor), Kolkata - 700001
(Beside Lalbazar 4-Point Crossing, above Axis Bank)

Contact for Treatment: +91-9831148112 | +91-9836913018

E-mail: doctorjakirhossain@gmail.com
brainmindiaclinic@gmail.com

Website: **www.brainmindiaclinic.com**

Facebook Page: Jakir Hossain Laskar
Facebook Group: Value Today

Official YouTube: Dr. Jakir Hossain Laskar
Organization YouTube: Oyster India Value Today

যে সব বিষয়ে ডাঃ জাকির হোসেন ছাত্র-ছাত্রীদের বিহেভিয়ার সাইকোথেরাপি ও এডুকেশনাল কাউন্সেলিং / চিকিৎসা করেন

অস্বাভাবিক আচরণ ঃ ছাত্রছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণ, অটিজম, এ.ডি.এইচ.ডি., অতিচঞ্চলতা, প্রচণ্ড রাগ ও বদমেজাজ, উগ্র স্বভাব, অপরাধপ্রবণতা, গালাগালি দেওয়া, স্কুল ফোবিয়া, পরীক্ষাভীতি, কাল্পনিক ভয়, মিথ্যাভাষী, চুরির বাতিক, নেশা-আসক্তি, মোবাইল-ফোন অ্যাডিকশন, ইত্যাদি।
লার্নিং ডিসএবিলিটি ঃ নতুন জিনিস শিখতে অসুবিধা, সদ্য শেখা জিনিস ভুলে যাওয়া, গণিত উপলব্ধি ও ভাষা প্রকাশের সমস্যা, অক্ষর পরিচয়-শব্দগুচ্ছ সাজানো-বাক্য গঠনে অসুবিধা, শিখণ প্রক্রিয়ার নানা সমস্যা, ইত্যাদি। **স্মৃতি ও মনঃসংযোগ ঃ** অল্পবুদ্ধি, বিলম্বিত মেধা, স্মৃতিসমস্যা, মনে রাখার ক্ষমতা হ্রাস, লেখাপড়ায় অমনোযোগী, পাঠে মনঃসংযোগ ও একাগ্রতার অভাব, ইত্যাদি।

Student's Counseling & Psychotherapy EduClinic